সংস্কারক

(পল্লীর নিখুঁত চিত্র)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

সাধনা লাইব্রেরী

১৩২৭।

মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শেঠ
সাধনা লাইব্রেরী,
২৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস্"
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উপহার

সংস্কারক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য-দলাদলি, ম্যালেরিয়া ও অভাবের সহিত সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া মহাজনের সুদ ও আসলের কড়া তাগাদা হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য সেনপুরের মধুসূদন ঘোষ যে দিন ইহলোকের পরপারে প্রস্থান করিল, সে দিন তাহার স্ত্রী-কন্যার উচ্চ ক্রন্দনে কাহারও সুনিদ্রার ব্যাঘাত না হইলেও শ্রাদ্ধের সময় মধুসূদনের পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য অনেকেই আকুল হইয়া পড়িলেন, এবং অন্ততঃ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইতে না পারিলে মধুসূদনের পরলোকগত আত্মা যে কিছুতেই ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারিবে না, মধুসূদনের বিধবা পত্নী কল্যাণীকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন।

কল্যাণী কিন্তু তখন একটি বিধবা কন্যা এবং নাবালক দুইটি পুত্রের কি গতি হইবে, এই চিন্তাতেই এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পরলোকগত স্বামীর ঊর্দ্ধগতি চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার আদৌ ছিল না। কিন্তু পাঁচ জনে যখন এই চিন্তাটাকে আপাততঃ সব চেয়ে বড় করিয়া দিতে লাগিল, তখন কল্যাণীও স্বামীর জন্য না ভাবিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া শেষে স্বামীর সদ্‌গতির উদ্দেশ্যে সাড়ে পাঁচ বিঘা জমির মধ্যে দুই বিঘা-জমি বিক্রয় করিতে স্থির করিলেন; বড়

মেয়ে বিরাজ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "জমি বাঁধা দিলে মনে ননেকে কি ক'রে মানুষ করবে মা ?"

কল্যাণী উত্তর করিলেন, "ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে বিরাজ, কিন্তু তাঁর কিছু হবে না ?"

বিরাজ বলিল, "তাঁর কিছু করতে গেলে ছেলেগুলোকে খাওয়াবে কি ? যে যাবার, সে গিয়েছে মা, এখন যারা আছে, তাদের মুখের দিকে চাইতে হবে তো ?"

কল্যাণী বলিলেন, "তা হবে বিরাজ, আর তাদের মুখের দিকে না চেয়েও থাকতে পারবো না। কিন্তু সেই যে একজন, সংসারে চিরকাল কষ্ট ভোগ ক'রে চ'লে গেল, তার কি আমাদের কাছে কিছুই দাবী নাই ? সে যদি পরলোকে গিয়েও সেই কষ্ট পায়, তা হ'লে আমাদের যে তার উপর বড্ড নিষ্ঠুরতা হবে মা।"

কল্যাণী আঁচলে চোখ মুছিলেন। বিরাজেরও চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, এক কাজ ক... হয় না ?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ রাজু ?"

বিরাজ বলিল, "জমি-জায়গা না বেচে আমার যে দু' একখানা গ... আছে, তাই বেচলে হয় না ?"

চিন্তিতভাবে কল্যাণী উত্তর করিলেন, "তা হয় না বিরাজ।"

"কেন হয় না মা ?"

"তোর যা দু' একখানা আছে, সে তোর অসময়ের সংস্থান।"

"আর এই জমি-জায়গা কি মনে ননের অসময়ের সংস্থান ... ছেলের অসময়ের সংস্থান, পেটের ভাতের সংস্থান বেচে যদি বাপের ... করা যায়, তবে মেয়ের গয়না বেচে কি শ্রাদ্ধ হয় না ?"

মেয়ের স্বরে একটু অভিমানের সাড়া পাইয়া মা এবং হাসিয়া বলিলেন, "এই এক পাগল মেয়ে! আমি কি বলছি যে, শ্রাদ্ধ হয় না? তবে ধর, মনে ননে বেটা-ছেলে, বাঁচে তো ওরা নিজের পেটের ভাত ক'রে নিতে পারবে। কিন্তু তোর সম্বলের মধ্যে ঐ তিনখানা গয়না; ওগুলো হাতছাড়া ক'রে দিলে এর পর তোর হবে কি?"

বিরাজ একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু ঐ তিনখানা গয়নাতেই কি আমার সারা জীবনটা, চ'লে যাবে?"

কৃত্রিম রোষভাব প্রকাশ করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "অত শত জানি না বাছা, তোর সঙ্গে তর্কে আমি পেরে উঠবো না।"

মৃদু হাসিয়া বিরাজ বলিল, "তর্ক আমি কাচ্চি না, কিন্তু তুমিই ভেবে দেখ দেখি মা, জমি দু' বিঘে বেচলে, এর পরে ছেলেদের মুখে দেবে কি? পাঁচ বিঘে জমির থাকবেই বা কত?"

কল্যাণী বলিলেন, "যা থাকে থাকবে; তাই ব'লে তোকে এখন হ'তে ...ার ভিখারী কত্তে পারবো না। তুই বুঝিস্ না বিরাজ, একে তো ...ার কপাল পুড়েছে, তার উপর তিনিও যখন চ'লে গেলেন, তখন তোকে দেখ্‌বার আর রইলো কে?"

মাতার এ কথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া বিরাজ চুপ করিয়া ..., এবং একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা মা!"

কল্যাণী বলিলেন, "কি বলছিস্ রাজু?"

...বরাজ কিছু বলিল না, শুধু মাতার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ...ই মস্তক নত করিল। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিলি, ...।"

...রাজ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "একবার মেজো দাদাকে ...দা করলে হয় না?"

কথাটা শুনিয়াই কল্যাণী চমকিয়া কন্যার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টিপাত করিলেন। বিরাজও কথাটা বলিয়াই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সে নত-মস্তকে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কন্যার এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া কল্যাণী একটু কোমলস্বরে বলিলেন, "সেটা কি ভাল হয় রাজু?"

"কেন ভাল হয় না মা?"

"তার সঙ্গে কি সে সম্পর্ক আছে?" বলিয়া কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিরাজ বলিল, "সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু বাবা যখন মারা যায়, তখন কেউ এসে একবার উঁকি মার্‌লে না। সে সময় সে-ই তো এসে বাবার শেষ-কাজ ক'রে গেল।"

কল্যাণী বলিলেন, "সে আলাদা কথা। বেজো নিজে ইচ্ছে ক'রে এসেছে। কিন্তু আমাদের উপযাচক হয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে"—

"দাঁড়ালে মাথা হেঁট হবে?"

"শুধু মাথা হেঁট হবে না, লোকে কি বল্‌বে? বিয়ের সময়ের কথা তোর মনে নাই কি?"

মাতার প্রশ্নে বিরাজের মুখখানা এমন লাল হইয়া উঠিল যে, মাতার সম্মুখে বসিয়া থাকিতেও সে যেন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে বাহিরে ননী কাঁদিয়া উঠিল। বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া ননীকে দেখিতে গেল। কল্যাণী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহকার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিরাজের বয়স যখন তিন বৎসর মাত্র, এবং মতি হাজরার ছেলে ব্রজনাথের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন মতি একদিন বন্ধু মধুসূদনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভায়া, বেজার সঙ্গে তোমার রাজুর বিয়ে দিতে হবে

মৃদু হাস্য দ্বারাই মধুসূদন এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল।

বিবাহে বাধাও কিছুই ছিল না। উভয় পক্ষই সমাবস্থ, সমান মর্যাদাসম্পন্ন। ইহার উপর ব্রজনাথ অল্পবয়সেই মাতৃহীন হওয়ায় এবং মতি হাজরা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায়, সে প্রায় বাড়ীতে থাকিত না, দিনের অধিকাংশ সময় রাজুদের বাড়ীতেই কাটাইয়া দিত। কল্যাণীকে সে জ্যেঠাইমা বলিয়া ডাকিত, এবং ঠিক মায়ের মত না হইলেও জ্যেঠাইমার কাছে যতটা পারিত, আবদার অভিমান করিয়া তাঁহার স্নেহ আদায় করিয়া লইত, এবং তাহাতে আপনার মাতৃস্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের স্নেহের অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে পারিত।

বিরাজও তখন ব্রজনাথের খুব অনুগত ছিল। তাহার খেলা-ধূলা হাসিকান্না বেজো-দাদার কাছে যেমন হইত, এমন আর কাহারও কাছে হইত না। দুই দণ্ড বেজো দাদাকে দেখিতে না পাইলে সে যেন অধীর হইয়া পড়িত। ব্রজনাথও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। যতক্ষণ রাজদের বাড়ীতে থাকিত, বিরাজকে কাছে কাছে রাখিত। যখন ব্রজ বাড়ী যাইত, তখন প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইত। তাহাদের বাল্যপ্রণয়-দর্শনে কেহ কেহ তাহাদিগকে বর-ক'নে বলিয়া পরিহাস করিত। সে পরিহাসের অর্থ ব্রজনাথ কতকটা বুঝিলেও বিরাজ আদৌ

বুঝিতে পারিত না ; এবং কোন কোন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনীর প্ররোচনায় বেজো-দাদাকে বর বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

তার পর বয়স বাড়িলে বর-ক'নের অর্থ যখন হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন বিরাজ আর ব্রজনাথকে বর বলিয়া সম্বোধন করিত না বটে, কিন্তু তাহার সহিত মেলা-মেশা করিতে ছাড়িত না। কিন্তু সে একাদশে পড়িলে যখন বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, এবং সে কথাটা ক্রমে পাকা কথায় পরিণত হইল, তখন হইতে ব্রজনাথের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতে বিরাজের যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া স্বরের স্পষ্টতাকে যেন অস্পষ্ট মৃদু করিয়া দিল। যে বেজো-দাদাকে না পাইলে তাহার দিন চলিত না, এখন সেই বেজো-দাদার সম্মুখে বাহির হইতে গেলে সে বুকের ভিতর একটা অস্বাভাবিক কম্পন অনুভব করিত।

ব্রজনাথও যে পূর্ব্ববৎ অসঙ্কোচে বিরাজের সম্মুখে আসিতে বা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত, তাহা নহে ; বরং বিরাজের নিকট হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিবার জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যেও বিরাজকে কাছে পাইবার জন্য তাহার যে একটা উৎকণ্ঠা জন্মিত, সেটাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারিত না, এবং সুযোগ পাইলেই বিরাজকে ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া, তাহার খোঁপায় টান দিয়া, গালে পিঠে চড় মারিয়া বিরাজের অতিরিক্ত লজ্জার প্রতিশোধ লইত।

ক্রমে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, এবং উভয় পক্ষ হইতেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

কিন্তু উদ্যোগ-আয়োজনটা কন্যাপক্ষে যেরূপ উৎসাহসহকারে চলিতে লাগিল, বরপক্ষে সেরূপ হইল না। না হইবার একটু কারণ ছিল। ব্রজনাথের বিমাতার এ বিবাহে তেমন মত ছিল না। ব্রজনাথ সেই

বৎসরই এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছিল, সুতরাং আরও দুই চারি জায়গা হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল এবং সে সম্বন্ধে বেশ লাভেরও সম্ভাবনা ছিল। লাভ থাকিলেও মতি হাজরা কথার খেলাপ করিতে সাহসী হইতেছিল না, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় পক্ষ বেশ নিবিষ্টচিত্তে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল যে, সেই লাভের তঙ্কা হইতে বিবাহের খরচ-খরচা বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে তাহার বেশ ভারী রকমের এক খানা গহনা হইতে পারে। সুতরাং সে স্বামীকে বুঝাইতে লাগিল যে, আজকালকার বাজারে কিছু না লইয়া ছেলের বিবাহ দিলে শুধু যে আর্থিক ক্ষতিই হয়, তাহা নহে, মান-মর্য্যাদারও হানি ঘটিয়া থাকে। আজকাল যাহারা নিতান্ত ইতর, তাহারাও ছেলের বিবাহে কিছু না লইয়া ছাড়ে না। আর এমন পাশ-করা ছেলেকে বিনা পয়সায় ছাড়িয়া দিলে লোকে কি বলিবে? কথার খেলাপ—বিবাহে এমন হইয়াই থাকে, লাখ কথার কমে বিবাহ হয় না, ছাঁদলাতলা হইতে বর ফিরিয়া যায়। তাহা ছাড়া নিরাজ যে তেমন পছন্দসই মেয়ে, তাহাও নহে। সুতরাং যাহাতে সুন্দরী সুরূপা বধূর সহিত কিছু নগদ অর্থ ঘরে আসে, সেইরূপ কাজ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

মতি হাজরা কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের দিন যতই নিকট হইয়া আসিল, দ্বিতীয় পক্ষের তর্জ্জন-গর্জ্জন ততই বাড়িয়া উঠিল। শেষে গাত্র-হরিদ্রার দিন সকালে সে মোটমাট বাঁধিয়া স্বামীকে বলিল, "তোমার ছেলের বিয়ে তুমি দাও, আমি বাপের বাড়ী চলিলাম।"

গৃহিণীর রাগ দেখিয়া হাজরা মহাশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং এতদূর আসিয়া কি উপায়ে বিবাহ বন্ধ করা যায়, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে মধুসূদনের নিকট

উপস্থিত হইলেন, এবং গৃহিণীর অনুরোধ জানাইয়া ঠিকুজী চাহিয়া লইলেন।

অপরাহ্ণে গাত্রহরিদ্রার কথা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হাজরা মহাশয় আসিয়া জানাইলেন যে, বিরাজের সন্তান-স্থানে শনি ও ধন-স্থানে রাহুর দৃষ্টি থাকায় তাহার বন্ধ্যা ও নির্ধন হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এরূপ কন্যার সহিত ব্রজনাথের বিবাহ দিতে অনেকেই নিষেধ করিতেছে। সুতরাং তিনি পাঁচ জনের নিষেধ শুনিবেন বা উপেক্ষা করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারায় আপাততঃ বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইতেছে।

মতি হাজরার মনোভাব বুঝিয়া লইতে মধুসূদনের বিলম্ব হইল না। বিবাহের সব স্থির, এমন সময় বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে শুনিয়া মধুসূদন শুধু মর্ম্মাহত হইলেন না, আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। তিনি আর মতি হাজরার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন না, অন্যত্র দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। তার পর দত্তের মাতৃশ্রাদ্ধে একটা তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তুমুল দলাদলি বাধাইয়া দিলেন। সে দলাদলি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া চলিল, এবং তাহার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই মতি হাজরা ও মধুসূদন ঘোষ উভয়েই একে একে পার্থিব লীলার অবসান করিয়া দিল।

বিরাজের বিবাহের পর ব্রজনাথ এফ-এ পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। তার পর মতি হাজরা কত জায়গায় পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিল। ব্রজনাথ কিন্তু বিবাহ করিল না, নানা প্রকার ওজর করিয়া পিতাকে নিরস্ত করিতে লাগিল। কয়েকবার চেষ্টার পর পিতা নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রের মনোবেদনা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না; বুঝিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। কিন্তু আর উপায় নাই। অগত্যা অন্তরের বেদনা অন্তরে চাপিয়া রাখিলেন।

ইহার উপর বিরাজ যে দিন বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, সে দিন আর একটা নূতন বেদনায় মতি হাজরার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সময় একটা পতিত ভিটার অংশ লইয়া মধু ঘোষের সঙ্গে মোকদ্দমা চলিতেছিল। মতিলাল আর মোকদ্দমার তদ্বির করিতে গেলেন না; মধু ঘোষেরই জয় হইল।

মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া মধু ঘোষ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া যখন গ্রাম্য দেবতা সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিতে যাইতেছিল, তখন মতিলাল বিছানায় পড়িয়া প্রবল জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিতেছিলেন, "বেজাকে সংসারী ক'রে যেতে পার্‌লুম না আমোদ।"

স্বামীর এই আক্ষেপের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমোদিনী লজ্জিত হইল। সে সলজ্জ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বেজো কি বিয়ে করবে না?"

"বিয়ে কর্‌লে এতদিন আমার কথা ঠেল্‌তো না।"

"পড়ার ক্ষতি হবে ব'লেই এখন বিয়ে কত্তে চায় না।"

ম্লান হাসি হাসিয়া মতিলাল বলিলেন, "রাজুর সঙ্গে বিয়ে হ'লে কি পড়ার ক্ষতি হ'তো না? তখন তো কোন আপত্তি করে নি।"

এ কথার উত্তর আমোদিনী দিতে পারিল না। মতিলাল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার পেটে তো কিছু হ'লো না। বেজা যদি বিয়ে না করে, হাজরা-বংশটা লোপ হ'য়ে যাবে।"

লজ্জাবিবর্ণমুখে আমোদিনী বলিল, "তুমি এত ভাব্‌চো কেন? বেজাকে বিয়ে কত্তেই হবে; আমি তার বিয়েতে হন্তারক হয়েছিলাম, আমিই আবার বিয়ে দেব।"

আশান্বিত-দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্‌বে?"

দৃঢ়স্বরে আমোদিনী বলিল, "যদি না পারি, তবে আমি কায়েতের মেয়েই নই।"

আমোদিনীর কথায় মতিলালের মুখখানা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ইহার অল্পদিন পরেই মতি হাজরার মৃত্যু হইল। ব্রজনাথ তখন এফ-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে পড়া ছাড়িয়া দেশে আসিয়া বসিল।

পিতার শ্রাদ্ধের সময় ব্রজনাথ মধু ঘোষের সহিত দলাদলি মিটাইতে চেষ্টা করিল; মধু ঘোষের পায়ে পর্য্যন্ত ধরিল। মধু ঘোষ কিন্তু কিছুতেই দলাদলি মিটাইল না, বরং যাহাতে মতি হাজরার শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়, তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টা কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হইল না, ব্রজনাথ কোনরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল।

তার পর ব্রজনাথ ঘরে আসিয়া বসিল এবং চাষবাসের তত্ত্বাবধান ও অধ্যয়ন দ্বারা দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই তাহাকে অনুরোধ করিল। ব্রজনাথ কিন্তু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিল না। সে প্রায় বাড়ীর বাহির হইত না, এবং কোন দিন ভুলিয়াও বিরাজের বাড়ীতে যাইত না। এইরূপে সর্ব্বদা ঘরের ভিতর বসিয়া থাকায় লোকে অসাক্ষাতে তাহাকে নানা কথা বলিয়া উপহাস করিত; কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিত যে, বেশী লেখাপড়া করায় তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে পাঁচজনে যখন ব্রজনাথকে কখন দিবাভীত পক্ষিবিশেষ, কখন বা বিকৃতমস্তিষ্ক কল্পনা করিয়া আনন্দ অনুভব করিত, ব্রজনাথ তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বেদান্তের জীবচৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকিত।

সে দিন একটু বেশী রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া ব্রজনাথ গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' শ্লোকটির অর্থ প্রণিধান করিতেছিল, এমন সময় মধু ঘোষের বাড়ী হইতে উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়া সুপ্তিমগ্ন পল্লীকে চমকিত করিয়া দিতেই ব্রজনাথ বুঝিতে পারিল, মধুসূদন ঘোষের আত্মা জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন বাসের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। ব্রজনাথ গীতা বন্ধ করিয়া হ্যারিকেনটা লইয়া মধু ঘোষের বাটীতে উপস্থিত হইল। তার পর হ্যারিকেন হাতে প্রতিবেশীদের দরজায় দরজায় ঘুরিয়া তাহাদের নাসিকাধ্বনি ব্যতীত যখন অন্য কোন সাড়াশব্দ পাইল না, তখন কোন-রূপে দুই এক জন লোক সংগ্রহ করিয়া মধু ঘোষের সৎকার সম্পন্ন করিল। সৎকার-শেষে শ্মশান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, প্রভাতে নিদ্রোত্থিত প্রতিবেশীদের সহানুভূতির সুরে মধু ঘোষের গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিধ্বনির সুরে সুর মিশাইতে না পারিয়া সে ধীরে ধীরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"বেজো দাদা!"

মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর আড় হইয়া পড়িয়া ব্রজনাথ একখানা মাসিকপত্রে পল্লী-সমাজের উন্নতি-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিল। সে ঠিক মাসিক পড়ার মত প্রবন্ধটা পড়িয়া যাইতেছিল না, সমস্ত পল্লী-সমাজটাকে চোখের উপর রাখিয়া লেখকের উক্তির কোন্ স্থলে কতটুকু সঙ্গতি বা অসঙ্গতি আছে, তাহা বেশ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য

বিরাজের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে নত-মস্তকে নীরবে পায়ের বুড়া আঙুলটা টিপিতে লাগিল। ব্রজনাথ মাসিকখানা কোলের উপর রাখিয়া তাহার মলাটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। বাহিরে রৌদ্রদগ্ধ প্রকৃতির বুকের উপর দিয়া তপ্ত বাতাসটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল; অদূরে গাছের মাথায় বসিয়া একটা ঘুঘু অবিরাম চীৎকারে মধ্যাহ্নগগন প্রতিধ্বনিত করিতেছিল।

ব্রজনাথ হঠাৎ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠা মহাশয়ের শ্রাদ্ধের কতদূর কি হয়েছে?"

বিরাজ বলিল, "সেই পরামর্শ চাইতেই এসেছি।"

বলিয়া সে আপনাদের অবস্থা, সামাজিকগণের পরামর্শ, মাতার অভিপ্রায়, সমস্ত একে একে বিবৃত করিল। শুনিয়া ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোমার অভিপ্রায় কি?"

বিরাজ বলিল, "আমি বলি, জমি বিক্রী করার চাইতে আমার যে দু' একখানা গহনা আছে, তাই বেচে বাবার শ্রাদ্ধ হোক্। কিন্তু মা তাতে রাজি হচ্চেন না।"

ব্রজ। কেন?

বিরা। তিনি বলেন, এর পর আমার কি হবে!

ব্রজ। সে কথা ঠিক।

বিরা। কিন্তু জমি বেচ্‌লে এর পর ছেলে দু'টা মানুষ হবে কি ক'রে? তারা খাবে কি?

ব্রজ। গহনা বেচ্‌লে তুমিই বা এর পর খাবে কি?

বিরা। আমি বিধবা, একটা পেট, কোন রকমে চ'লে যেতে পারে।

ব্রজ। একটা পেটেও ত রোজ কিছু দিতে হবে। রোজ না দাও, এক দিন অন্তরও কিছু না দিলে চল্‌বে না।

ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বিরাজ বলিল, "ছাই দিতে হবে। বিধবার আবার পেটের ভাবনা!"

ব্রজনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "তুমি বুঝ্‌চো না রাজু, অপরের চাইতে বিধবারই ভাবনা বেশী। আমাদের হিন্দুর ঘরে নিতান্ত অভাগা যদি কেউ থাকে, তবে সে বিধবা। হিঁদুর সংসারে বিধবার চাইতে—বিশেষ বালবিধবার চাইতে অনাথ জীব আর দ্বিতীয় নাই। বাইরে আমরা এদের যতই উচ্চপদ দিই, এদের নিয়ে সারা জাতিটার মধ্যে যতই শ্লাঘা প্রকাশ করি, ঘরে কিন্তু একটা পোষা জানোয়ার যতটুকু স্নেহ পায়, এদের উপর ততটুকু স্নেহ-যত্ন দেখাই কি না সন্দেহ।"

ব্রজনাথের দৃষ্টি সহানুভূতিতে কোমল হইয়া আসিল। একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "সমাজের যখন এই অবস্থা, তখন বিধবার সামান্য সম্বলটুকুও নষ্ট কত্তে পরামর্শ দিতে পারি না।"

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি জমি বেচ্‌তেই পরামর্শ দাও?"

ব্রজনাথ উত্তর করিল, "নিতান্ত নির্ব্বোধ যে, সেও এমন পরামর্শ দেয় না।"

বিরা। তা হ'লে উপায়?

ব্রজ। যেমন অবস্থা, সেইভাবে কাজ নির্ব্বাহ করাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

বিরা। তা হ'লে তো বাবা একটা পিণ্ডি পর্য্যন্ত পান না।

ব্রজ। পিণ্ডিটা দিতেই হবে। আর তার জন্য গয়না বিক্রী বা জমি বিক্রীর দরকার হয় না। তবে ব্রাহ্মণভোজন স্বজাতিভোজন করাতে হ'লে সে অন্য কথা।

বিরা। সেগুলা তো ওরই আনুষঙ্গিক।

ব্রজ। আনুষঙ্গিকের ত্রুটিতে আসল কাজের কোন ক্ষতি হয় না।

বিরা। কিন্তু পাঁচজনে কি বল্‌বে?

ব্রজ। খুব নিন্দা কর্‌বে। বল্‌বে, মধু ঘোষের নাবালক ছেলের এমন অক্ষম যে, আমাদের পাতে দু'খানা লুচি দিতে পার্‌লে না। এর বেশী আর কিছু বল্‌তে পার্‌বে না।

বিরাজ লজ্জারক্ত-মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। ব্রজনাথ মাসিকের মলাটের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল, "সে নিন্দাটা মাথা পেতে নিতে পার্‌বে না?"

"নাঃ" বলিয়া ব্রজনাথের মুখের উপর তিরস্কারসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিরাজ উঠিবার উপক্রম করিল। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "লোক মাতৃপিতৃদায়ে অপরের সাহায্য লয়। তা নিতে পার্‌বে?"

রোষ-তীব্রকণ্ঠে বিরাজ বলিল, "মনে ক'রো না, আমি তোমার কাছে অর্থ-সাহায্য নিতে এসেছি।"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে ব্রজনাথ বলিল, "সেটা আমি মনে করি না। কিন্তু নিলে দোষ আছে?"

তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল; রোষ-তীব্রকণ্ঠে বলিল, "তোমার কাছে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে বেজো-দাদা।"

বলিয়া সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। ব্রজনাথ নীরবে বসিয়া পেন্সিলের গোড়াটা আপনার কপালে ঘষিতে লাগিল। বাহিরে ঘুঘু-পাখীটা তখনও আকুল-চীৎকারে আকাশ কাটাইয়া দিতেছিল। ব্রজনাথ পাশের জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। নির্জ্জন পল্লী-পথ মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড কিরণে যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্রজনাথ পুনরায় শুইয়া পড়িল এবং মাসিকের পাতা উল্টাইয়া একটা ছোট গল্প বাহির করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ করিয়া ব্রজনাথ একটু আগ্রহের সহিত সবেমাত্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার বাহির হইতে আমোদিনী ডাকিল, "হাঁরে ব্রজ!"

দরজার দিকে ফিরিয়া ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কেন নতুন-মা?"

"কে মেয়েটি এসেছিল রে? ঘোষেদের রাজু না?"

আমোদিনী আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। ব্রজনাথ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করিল, "হাঁ।"

আমোদিনী বলিল, "মেয়েটা অমনতর হ'য়ে গিয়েছে? হঠাৎ দেখ্‌লে যেন চেনা যায় না।"

ব্রজনাথ নিরুত্তরে মাসিকের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এয়েছিল? বাপের শ্রাদ্ধের যুক্তি নিতে বুঝি? শ্রাদ্ধটা খুব জাঁকিয়ে কর্‌বে বোধ হয়।"

আমোদিনীর অধরপ্রান্তে শ্লেষের মৃদু হাস্যরেখা দর্শনে ব্রজনাথ যেন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ ক'র্‌বার ক্ষমতা থাকিলে আমার কাছে পরামর্শ চাইতে আস্‌ত না।"

তাহার এই বিরক্তিটুকু লক্ষ্য না করিয়া আমোদিনী বলিল, "তবে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছিল বুঝি?"

ব্রজ বলিল, "সাহায্য চাইতে এলে আমার কাছে আস্‌ত না মা, তোমার কাছেই যেতো নতুন-মা।"

আমোদিনী বলিল, "আমার কাছে গেলে কতকগুলো গাল ছাড়া আর কিছু পেতো না।"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "তুমি বুঝি আজকাল গাল দিয়েই লোকের সাহায্য কর মা?"

আমোদিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সে কথা কি তুই আজ জান্‌লি ব্রজ? গাল ছাড়া আর কিছু যে কাউকে কখন দিই না, এটা গাঁয়ের সকলেই যে জানে।"

"তবে এবার এলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব মা।"

বলিয়া ব্রজনাথ ঈষৎ হাসিল। আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার আস্‌বে নাকি?"

"বোধ হয়।"

"তোকে তা' হ'লে মুরুব্বি ধ'রেছে বল্?"

"কেন, ওদের আপনার লোকের অভাব কি?"

"লুচি খাবার লোকের অভাব নাই বটে।"

"পরামর্শ দেবার লোকও অনেক আছে। তাদের পরামর্শে ঐ ঘোষজা খুড়ো-কর্ত্তাকে একঘরে ক'র্‌বার চেষ্টা করেছিল, সে কথা তোর মনে আছে বোধ হয়?"

"শুনেছিলাম বটে।"

"শুনেছিলি কেন, এই ত সে দিনের কথা। ঐ যে আমার নাম ক'ত্তে নাই, নাচু দত্তের মায়ের শ্রাদ্ধে ভৈরব চক্কোত্তিকে নিয়ে কম কাণ্ডটা কি করেছিল। গাঁয়ের সব এক কাট্টা, আর উনি একা একদিকে। তখন ঐ গয়লা-পুকুর নিয়ে মামলা চল্‌চে। উনি ওই পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকার দিয়ে বল্‌লেন, কোন্ বেটার সাদ্দি আমায় এক-ঘরে করে! বেটাদের চাল কেটে একে একে এই গয়লা-পুকুরের জলে ফেল্‌বো না।

ফলনা হাজরার সঙ্গে চালাকি ? সেই হাঁকার না শুনে সব তো ভয়ে তটস্থ। ভৈরব ঠাকুর ছুটে এসে বল্লেন, বাবাজি, তুমি না দাঁড়ালে কি নাচু দত্তের মায়ের শ্রাদ্ধ হ'তে পারে ? ব্যস্, শেষটায় ঘোষজা নিজেই আলাদা হ'য়ে রইলো।"

ব্রজনাথ কিন্তু এই দলাদলির কথাতে আদৌ উৎসাহ প্রকাশ করিল না; সে ধীর-গম্ভীরভাবে বিমাতাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, এই দলাদলিটা আদৌ প্রশংসনীয় কার্য্য নহে, বরং তাহার বিপরীত। এই যে আমাদের পল্লী-সমাজের অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে, অন্যান্য অনেক কারণ থাকিলেও দলাদলিই ইহার একটা প্রধান কারণ এবং এই দলাদলি বা আত্ম-বিরোধের ফলেই আমরা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতেছি না। সুতরাং এই আত্মবিগ্রহ পরিহারপূর্ব্বক পরস্পর সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করাই আমাদের কর্ত্তব্য; নতুবা এই অধঃপতনের পিচ্ছিল পথ হইতে আমরা কিছুতেই উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইব না।

স্থিরভাবে তাহার এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি এই দলাদলি মিটিয়ে সব এক ক'ত্তে পা'র্বে ?"

ব্রজনাথ বলিল, "চেষ্টা ক'র্লে বোধ হয় পা'র্বো।"

আমো। তা' হ'লে তুমি ঘোষজার শ্রাদ্ধে যা'চ্চো।

ব্রজ। নিশ্চয়।

আমো। যদি ওরা না ডাকে ?

ব্রজ। খুব সম্ভব ওরা ডাক্বে না। কিন্তু না ডাক্লেও আমাকে যেতে হবে।

আমো। সেধে যাবে ?

ব্রজ। তা'তে দোষ কি মা ? যেখানে একটু হীনতা স্বীকার ক'র্লে

সমাজের একটা মস্ত উপকার হয়, সেখানে আমার মান অপমানের দাবী দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে কেন? সমাজের কাছে আমি কতটুকু? দেশের উন্নতির কাছে আমার ব্যক্তিগত সম্মানের মূল্য কি? সমাজের উন্নতি যে আমার সব চেয়ে বেশী গৌরবের জিনিস মা।"

মধু ঘোষের শ্রাদ্ধে ব্রজনাথ সাধিয়া উপস্থিত হইলে সমাজের কি উন্নতি হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমোদিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে ব্রজনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই বলিস্‌ কিরে ব্রজ, যাদের সঙ্গে আজ চার বচ্ছর মুখ দেখাদেখি নাই, কত মামলা মোকর্দ্দমা, মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল, আজ তুই সেধে তাদের সঙ্গে মিল ক'র্ত্তে যাবি, লোকে ব'ল্‌বে কি?"

ব্রজনাথ একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "লোকে ব'ল্‌বে, মতি হাজরা দলাদলি বাধিয়ে যে পাপ করে গিয়েছিল, ছেলে তার নিষ্পত্তি করে দিয়ে বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছে।"

একটু ভাবিয়া আমোদিনী বলিল, "সে কথা কেউ বল্‌বে না বাছা, বরং পাঁচ রকম কুচ্ছো গেয়ে বেড়াবে।"

ব্রজনাথের ওষ্ঠাধর-প্রান্তে অবজ্ঞার মৃদু হাস্য-রেখা প্রকটিত হইল; সে মাথাটা একবার দোলাইয়া বলিল, "সেই পাঁচজনের কুচ্ছোর ভয়ে তুমি কি মনে কর মা, আমি চুপ ক'রে বসে সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখ্‌বো?"

আমো। কি করবি?

ব্রজ। আমার যতটুকু শক্তি-সামর্থ আছে, সব দিয়ে এই অধঃপতনের পিচ্ছিল পথ হ'তে সমাজকে টেনে আন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো।

আমো। তোর সে চেষ্টা কি সফল হ'বে মনে করিস্‌?

ব্রজ। গীতায় বল্‌ছে—"মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মাসঙ্গস্তে কর্ম্মণি।" অর্থাৎ ফলের আশায় কর্ম্ম ক'রো না, আবার নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসেও থেকো

না। এই নিশ্চেষ্টতাই তো আমাদের দেশের যত সর্ব্বনাশ করেছে মা। তা' নইলে এই যে ঘরে ঘরে মামলা মোকর্দ্দমায় লোক সর্ব্বস্বান্ত হ'চ্চে, বছর বছর ম্যালেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস ক'চ্চে, তুমি কি মনে কর এর কোন প্রতিকার নাই ?"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া আমোদিনী বলিল, "তুই পাগল হ'য়েছিস্ ব্রজ ? পরমায়ু শেষ হ'লে লোক মারা যাবে, তার আবার প্রতিকার কি আছে ?"

উত্তেজিতভাবে ব্রজনাথ বলিল, "নিশ্চয়ই আছে। ইয়ুরোপের এক একটা দেশেও এক সময়ে এই রকম বছর বছর হাজার হাজার লোকের পরমায়ু শেষ হ'তো, আর দেশের লোকেরা পরমায়ুর দোহাই দিয়ে চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকৃতো। কিন্তু তার পর তারা যখন বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, তাদের এই চুপ ক'রে বসে থাকাটাই পরমায়ু শেষ হ'বার মূল কারণ, তখন তারা এই পরমায়ুটা যা'তে শেষ না হয়, তার জন্য উঠে পড়ে লাগ্‌লো। তার ফলে এখন তাদের হাজারে পাঁচটারও পরমায়ু শেষ হয় কি না সন্দেহ।"

মৃত্যুর সহিত—অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ। আমোদিনী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ বলিল, "আমিও একবার দেখ্‌বো নতুন-মা, ম্যালেরিয়ার হাত হ'তে দেশের লোকের পরমায়ু রক্ষা করা যায় কি না ; দলাদলির বীজটাকে উপ্‌ড়ে সমাজের বাইরে টেনে ফেলা যায় কি না। আমার এ উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে না, তা' জানি, এর তরে আমাকে দু'শো বছর আগেকার সমাজকে এনে এই বর্ত্তমান সমাজের সাম্‌নে খাড়া ক'ত্তে হ'বে ; যেখানে দু'জনের মত এক নয়, সেখানে দু-হাজারের মতকে এক ক'রে তুল্‌তে হ'বে। এইটাই সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান আমাকে ক'ত্তেই হবে। আর

সেইটাই হচ্চে আমার জীবনের প্রধান সাধনা। তুমি শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর নতুন-মা, আমার এই সাধনার কাছে নিজের মান অপমানকে যেন কোন দিন খাড়া ক'রে না তুলি।"

প্রাণের আবেগে কথাগুলা বলিয়া ফেলিয়া ব্রজনাথ আশান্বিত-দৃষ্টিতে বিমাতার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সাধনার ব্যাপারটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার আবেগময়ী ভাষার মধ্য দিয়া অন্তরের যে ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই আমোদিনী যেন ব্রজনাথের উদ্দেশ্যের মহত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রশংসা-সমুজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

তখন রোদের তেজ হ্রাস পাইয়াছিল; ঘুঘুটা ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া নীরব হইয়াছিল; রৌদ্রতপ্ত বাতাসের স্পর্শের মধ্যে যেন একটু স্নিগ্ধতা আসিয়াছিল। ব্রজনাথ উঠিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিল, এবং এক এক পা অগ্রসর হইয়া অদূরবর্ত্তী শিবের আট-চালায়—যেখানে রামধন সরকার মহাশয় ছাত্রদিগকে 'ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার' প্রভৃতি নাম লিখাইয়া দুরূহ শব্দ-লিখন শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই খানে গিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ও-বাড়ীতে গিয়েছিলি রাজু ?"

"গিয়েছিলাম।"

"বেজো কি বল্‌লে ?"

"ভিখিরীর দুঃখের কাহিনী শুনে গেরস্ত যা' বলে।"

"কি বলে ?"

"বলে, একমুঠো চাল নিয়ে চলে যাও।"

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া মা বলিলেন, "তবে প'ড়ে মত্তে গিয়েছিলি কেন ?"

রাজু একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "ভিখারীর স্বভাব। সে মনে করে, লোকের কাছে দুঃখের কাহিনী বল্‌লে বোধ হয় কিছু একটা উপায় হবে। কিন্তু শেষে যখন দেখে যে, সেই একমুঠো চাল, তখন নিজের মূর্খতায় নিজেই হেসে চলে যায়।"

"তুইও বুঝি হেসে চলে এলি ?"

"তা নয় তো কি কেঁদে আপনার শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে আস্‌বো।"

"কম বাহাদুর মেয়ে তুই।" তীব্রকণ্ঠে কথাটা বলিয়া কল্যাণী মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। বিরাজ প্রদীপের আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া নীরবে খই বাছিতে লাগিল।

কল্যাণী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কন্যার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এই তরেই আমি না তোকে যেতে বারণ করেছিলাম ?"

বিরাজ কোন উত্তর দিল না। কল্যাণী বলিলেন, "আমি জানি, ওখানে যাওয়া মিছে। আজ প্রায় পাঁচ বচ্ছর ওদের সঙ্গে বিবাদ চ'লে

আস্‌ছে, কত মামলা মোকদ্দমা হ'য়ে গেল। সে সব ভুলে গিয়ে আজ ওরা তোদের দায়ে মাথা দিতে আস্‌বে ?"

বিরাজ মুখ তুলিয়া শান্তস্বরে বলিল, "আসেনি কি মা ? বাবা যখন বাইরে প'ড়ে, জনপ্রাণী এসে উঁকি মার্‌লে না, তখন ওরাই তো এসে বাবার গতি কর্‌লে।"

কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি জানি, বেজো সে সময়ে কি মনে ক'রে এসেছিল। কিন্তু তুই যাই বলিস্ বাছা, বেজোর আর সে মন নাই। নয় তো সেই যে গতি ক'রে গিয়েছে, তার পর আজ বাইশ দিনের মধ্যে একবার এসে উঁকি দিলে না; কি হবে না হবে তার কোন খবর নিলে না। অথচ এই বেজো আমার মাই খেয়ে মানুষ হয় নি বটে, কিন্তু—"

উচ্ছ্বসিত অভিমানের আবেগে স্বরটা গাঢ় হইয়া আসিল, একটা জোর নিঃশ্বাসে সে আবেগটাকে যেন ঠেলিয়া বাহির করিয়া কল্যাণী বলিলেন,— "চুলোয় যাক্, পুরুত ঠাকুর এসেছিলেন যে ?"

বিরা। কি ব'লে গেলেন ?

কল্যা। বল্‌লেন, :কিছু থাক্ আর নাই থাক্, ফল্‌না ঘোষ ব'লে একটা নাম ডাক তো ছিল। নেহাৎ তিলকাঞ্চনে নমো নম ক'রে সার্‌লে লোকে কি বল্‌বে ? বেশী আর কিছু না হোক্, ষোড়শ একটা কর্‌া দরকার।

বিরা। তাতে খরচ কত প'ড়্‌বে ?

কল্যা। এর উপর আর তিরিশ চল্লিশ টাকা বেশী।

বিরা। তার পর ?

কল্যা। তার পর বলেন, গাঁয়ের বামুনগুলি, ঘর পেছু এক একটী বল্‌তে গেলে নেহাৎ খারাপ দেখায়; আর বামুনই কত, পঞ্চাশ ষাটের

বেশী হবে না। তার পর স্বজাতি কুটুম্ব সেগুলি তো না বল্‌লেই চল্‌বে না। তা হ'লে মোটের উপর শ'দুই লোকের আয়োজন কত্তে হবে।

বিরাজ ভারী মুখখানাকে আরও নীচু করিয়া খইগুলা নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। কল্যাণী বলিলেন,—"দিনও বেশী নাই; মাঝে সাতটা দিন, এর মধ্যে সমস্ত আয়োজন কত্তে হবে। কাল ও-বাড়ীর বড়ঠাকুরকে নিয়ে আস্‌বেন ব'লে গিয়েছেন।"

বিরাজ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "বেশ।"

কল্যাণী বলিলেন,—"আমি টাকা কড়ির কথা সবই তাঁকে খুলে বল্‌লাম। তিনি বলেন, টাকার ভাবনা কি? জমি রাখ্‌লে কত লোক টাকা দেবার তরে হাত ধুয়ে বসে আছে। পাঁচ বিঘে জমি বাঁধা রাখ্‌লে এক্ষুণি আড়াই শো তিন শো টাকা দেবে। তারপর তাঁর আশীর্ব্বাদের জোর থাকে, মণীন্দ্র মানুষ হ'য়ে জমি খালাস ক'রে ফেল্‌বে।

রুক্ষস্বরে বিরাজ বলিল,—"তবে আর ভাবনা কি!"

বলিয়া সে ব্যস্ত-হস্তে বাছা খইগুলা চুপড়ীতে তুলিতে লাগিল। কল্যাণী বলিলেন,—"রাগ করিস্ কেন বাছা, পাঁচ জনে যা বলে, তাইতো কত্তে হবে। আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি, কি জানি। পাঁচজনই এখন আমাদের অভিভাবক; তাদের কথা না শুন্‌লে চল্‌বে কেন।"

ঝঙ্কার দিয়া বিরাজ বলিল,—"স্বচ্ছন্দে তুমি শুন্‌তে পার, কে তোমাকে বারণ ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে বল।"

তাহার রাগ দেখিয়া কল্যাণী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"তুই এক মেয়ে বাছা, সকল কথাতেই রাগ। ভাল, তুই কি কত্তে বলিস্ বল্‌তো।"

রোষ-গম্ভীর-কণ্ঠে বিরাজ বলিল, "আমি কিছু বলি না, তোমাদের যা খুসী ক'ত্তে পার।"

কল্যাণী আর কিছু বলিলেন না। বিরাজ বলিল ... ছেলে

দু'টোকে খেতে দেবে, না দু'শো লোক খাওয়ালেই তাদের পেট ভরে যাবে।"

"দু'জনেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে, দেখি।"

বলিয়া কল্যাণী উঠিয়া ঘরে ঢুকিলেন। চুপড়ীটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বিরাজ নীরবে বসিয়া রহিল। বাতাসে প্রদীপের শিখা কাঁপিতে লাগিল; একটা খদ্যোত ক্ষুদ্র বহ্নিস্ফুলিঙ্গের স্তায় অন্ধকার প্রাঙ্গণের এদিকে সেদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল; বিড়ালটা দাওয়ার একপাশে থাবা পাতিয়া বসিয়া একদৃষ্টে তাহার এই ধাবন কূর্দ্দন লক্ষ্য করিতেছিল। উঠানের মাঝখানে পেয়ারা-গাছটা ভূতের মত দাঁড়াইয়া অন্ধকারে ডাল নাড়িতেছিল। সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

যতই ভাবিতে থাকিল, ততই তাহার নিজের উপর রাগ হইতে লাগিল। সে কেন না বুঝিয়া, মায়ের নিষেধ না শুনিয়া, ব্রজনাথের নিকট পরামর্শ চাহিতে গেল! তাহাতে ব্রজনাথের নিকট আপনাকে খাটো করা ছাড়া আর তো কিছুই লাভ হইল না। কিন্তু কে জানিত, এই কয় বৎসরের মধ্যে বেজো-দাদা এতটা পর হইয়া গিয়াছে। পর হইলেও কি একটা সৎ-পরামর্শ দিতে নাই? সে যদি আসিয়া মাকে বুঝাইয়া দিত, পাঁচ জনের কথায় জমি বিক্রী করিয়া শ্রাদ্ধ করা উচিত হয় না, এবং রাজুরই দুই একখানা গহনা বেচিয়া কোনরূপে কাজটা শেষ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে মা কখনই তাহার কথা ঠেলিতে পারিতেন না। এইটুকু উপকারের প্রত্যাশাও কি বেজোদাদার কাছে নাই? কে জানে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোভাব এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনে বিরাজ শুধু বিস্ময় অনুভব করিল না, ব্রজনাথের উপর রাগে তাহার মনটা যেন তিক্ত হইয়া আসিল।

একটা পেঁচা কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বিরাজ চম্‌কিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে ব্রজনাথ ডাকিল, "জ্যেঠাই-মা!"

কল্যাণী ঘরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ডাক্‌চে? ব্রজো না?"

গম্ভীরস্বরে "হাঁ" বলিয়া বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বাহির হইতে পুনরায় ডাক আসিল, জ্যেঠাই মা!"

কল্যাণী গৃহপ্রবিষ্টা বিরাজের দিকে একবার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ব্রজনাথ বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজু কোথায়?"

"এই যে ঘরেই আছে" বলিয়া কল্যাণী আসন পাতিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ বলিল, "একটা কথা বল্‌তে এলাম জ্যেঠাই-মা।"

"কি কথা ব্রজ?" বলিয়া কল্যাণী ঈষৎ কৌতূহলান্বিতভাবে ব্রজনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। ব্রজনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "জ্যেঠা মহাশয়ের শ্রাদ্ধে গাঁয়ের দলাদলিটা মিটিয়ে ফেল্‌লে হয় না?"

দৃষ্টি স্থির রাখিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কল্যাণী উত্তর করিলেন, "হয়। কিন্তু মেটাবে কে?"

"আমি মেটাব।"

"কেন?"

প্রশ্নটা খুব কঠিন বলিয়া বোধ হইলেও ব্রজনাথ একটু হাসিয়াই উত্তর করিল, "গাঁয়ে দলাদলি থাকা ভাল কি ?"

"মন্দটা কিসে তাই শুনি।"

"প্রথমতঃ তাতে সমাজের উন্নতি হয় না।"

"তার পর ?"

"পরস্পরের মধ্যে একটা হিংসা দ্বেষ বর্ত্তমান থাকে।"

"একবার দলাদলি মিটিয়ে দিলেই কি লোকের মন থেকে হিংসা দ্বেষ চলে যাবে ?"

"একেবারে না গেলেও অনেকটা কম হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "হিংসা দ্বেষের কি কম বেশী আছে ব্রজ ?"

ব্রজনাথ লজ্জিত হইল ; বলিল, "তা হ'লে কি তুমি বল জ্যেঠাই-মা, দলাদলি মেটাবার দরকার নাই ?"

কল্যাণী বলিলেন, "দলাদলি থাকা যে ভাল, এমন কথা আমি বলি না ব্রজ, কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ হ'লেও যতটুকু বুঝি, তাতে এ দলাদলি, এই হিংসাদ্বেষ একেবারে মিট্‌বে না।"

ব্রজনাথ বলিল, "তবু আমি একবার চেষ্টা দেখ্‌বো জ্যেঠাই-মা।"

কল্যাণী বলিলেন, "তোমার সঙ্কল্প সাধু। চেষ্টা করে দেখ।"

সহর্ষে ব্রজনাথ বলিল, "তা হ'লে তুমি অনুমতি দিচ্চো জ্যেঠাই মা ?"

কল্যাণী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু এই কাজ উপলক্ষে দলাদলি মিটিয়ে কি কর্‌বে ব্রজ ?"

বিস্মিতভাবে ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন জ্যেঠাই-মা ?"

কল্যাণী বলিলেন, "এতগুলি লোককে আবাহন কর্‌বার সঙ্গতি তো আমার নাই।"

ব্রজনাথ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগল। কল্যাণী বলিলেন, "আমি দশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে শুদ্ধ হব মনে করেছি। আমার অবস্থা তো জান।"

চিন্তা-মলিনমুখে ব্রজনাথ বলিল, "তা হ'লে উপায়?"

কল্যাণী নিরুপায়ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কতক্ষণ ভাবিয়া ব্রজনাথ বলিল, "আচ্ছা, জ্যেঠাই-মা?"

"কেন বেজ?"

"জমি-জমা না বেচে শুধু হাতে কিছু বেশী টাকা ধার করলে হয় না?"

"শুধু হাতে আমাদের কে টাকা দেবে?"

"যার টাকা আছে সেই দেবে। কত টাকা তুমি চাও জ্যেঠাই-মা? পাঁচ শো?"

কল্যাণী বলিলেন, "এত টাকার দরকার কি ব্রজ?"

ব্রজনাথ বলিল, "খুব দরকার আছে। দলাদলি মিটিয়ে গাঁয়ের সব লোকগুলিকে আবাহন ক'ত্তে হবে।"

কল্যাণী চিন্তিতভাবে বলিলেন, "এত টাকা ধার দেবে!"

মাথা নাড়িয়া জোর-গলায় ব্রজনাথ বলিল, "আচ্ছা, সে ভার আমার। তুমি এদিক্‌কার চেষ্টা দেখ, জ্যেঠাই-মা। আজ আমি উঠি, কাল আবার আস্‌বো।"

ব্রজনাথ উঠিতে উদ্যত হইল। এমন সময় বিরাজ ঝড়ের মত বেগে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শুধু-হাতে এত টাকা কে দেবে শুনি?"

ব্রজনাথ সভয়-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বিরাজ ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "তুমি মাকে বুঝিয়ে দিতে পারো বেজো-দা, কিন্তু আমাকে সহজে বোঝাতে পারবে না; আমি কচি খুঁকিটী নই।"

ব্রজনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না না, তুমি সেই আদ্যিকালের বড়াই বুড়ী। তোমাকে কি কচি খুঁকী অপবাদ দিতে পারি।"

বলিয়া সে বিরাজের মুখের দিকে হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেই বিরাজ তীব্র বেগে মুখ ফিরাইয়া লইল। কল্যাণী ধীর শান্তস্বরে বলিলেন, "রাগ করিস্ কেন রাজু, ব্রজ কি এমন মন্দ কথা বলেছে?"

রুক্ষস্বরে বিরাজ বলিল, "খুব ভাল কথা মা। কিন্তু ভিক্ষা করা টাকায় বাবার শ্রাদ্ধ কখনো ক'ত্তে দেব না, এই আমি ব'লে রাখ্ছি।"

বলিয়া সে যেমন বেগে ঘরের বাহিরে আসিয়াছিল, তেমনি বেগে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ব্রজনাথ ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিল, "পাগল! সত্যি জ্যেঠাই-মা, রাজু এখনো যেন সেই ছেলেবেলার রাজুই আছে।"

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ওই পোড়া-কপালীকে নিয়ে আমি যে কি করবো, তা ভেবেই পাই না।"

ব্রজনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না জ্যেঠাই-মা?"

"কি কাজ ব্রজ?"

"যদি শুধু-হাতে টাকা নিতেই রাজুর আপত্তি থাকে, তবে ওর যে গয়নাগুলো আছে, সেই গুলো জামিন রেখে টাকা নিলে তো চলে?"

বিষাদগম্ভীর স্বরে কল্যাণী বলিলেন, "ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। আমার মাথার কিছু ঠিক নাই বাবা, তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।"

ব্রজনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আচ্ছা, ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা হয় ঠিক্ কর। আমি কাল সকালেই আস্ছি।"

ব্রজনাথ চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে রাজুর রাগের কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাহার হাসি আসিল। রাজু যেন

নিতান্ত ছেলে মানুষ। এখনো তেমনি রাগ, তেমনি অভিমান, তেমনি আব্দার। বয়স হইলেও বুদ্ধি যে তাহার একটু বাড়িয়াছে, এমন তো মনে হয় না। নতুবা ব্রজনাথকে সে পর ভাবিতে পারে, এবং তাহার নিকট অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিলে আত্মসম্মানে আঘাত পড়িবে এমন কথাটা মনেও আনিতে পারে! লোকে ভিক্ষুককে যে ভাবে ভিক্ষা দেয়, ব্রজনাথ কি সেই ভাবেই তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত? তাহার সহিত কি একটুও নিকট-সম্বন্ধ নাই? একদিন যে—দূর হউক, ছেলে-মানুষের কথা ভাবিবার যোগ্যই নহে।

এইরূপে বিরাজকে খুব ছেলে মানুষ এবং আপনাকে যথেষ্ট প্রবীণ ভাবিয়া লইয়া ব্রজনাথ যখন একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে যে জ্যেঠাই-মাকে এতগুলা টাকা দিবে, সেই টাকাটা সে কোথা হইতে পাইবে? তাহার টাকা কড়ি যাহা কিছু সব নতুনমার হাতে। চাহিলে যে নতুন-মা টাকাটা তাহাকে দিবেন না এমন নয়, কিন্তু কি বলিয়া সে চাহিবে? কথাটা ভাবিতে ব্রজনাথের মন লজ্জায় যেন মুষড়িয়া পড়িল। এ অবস্থায় ছেলে মানুষ হইলেও রাজু ঠিক কথাই বলিয়াছে! উপায়ও হইয়াছে; গহনা রাখিয়া সহজেই নতুন-মার নিকট হইতে টাকা লওয়া যাইবে। উঃ, ছেলে মানুষ হইলেও রাজু তাহাকে কি বিষম লজ্জা হইতে উদ্ধার করিয়াছে!

রাজুর এই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে করিতে ব্রজনাথ মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা একটা করুণ চীৎকারে চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সম্মুখেই গিরিশ সরকারের বাড়ী। চীৎকার শুনিয়া ব্রজনাথ মুহূর্ত্ত-কাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া, তারপর দ্রুতপদে সেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। কয়েক পদ যাইতেই গিরিশ সরকারের মেয়েটা ছুটিয়া আসিয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিল, "ওগো, একবার এস গো, বাবা কেমন কচ্চে গো।"

বলিয়াই সে ব্রজনাথের হাতখানা ধরিয়া বাড়ীর দিকে আকর্ষণ করিল। ব্রজনাথ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন বোধে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

গিরিশ সরকার দাওয়ার উপর মরার মত পড়িয়াছিল। তাহার স্ত্রী পাশে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাতাস করিতেছিল। ব্রজনাথকে দেখিয়া সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। ব্রজনাথ ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে মাতার ইঙ্গিতে সেই বারো বছরের মেয়েটা বলিল যে, তাহার পিতা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাছারীতে গিয়াছিল; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রজনাথ আলো লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, গিরিশের সর্ব্বাঙ্গে প্রহার-চিহ্ন, মাথার এক স্থান কাটিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। ব্রজনাথ ক্ষত-স্থানে ভিজা কাপড় বাঁধিয়া দিয়া, তার পর গিরিশের স্ত্রীকে অভয় দিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ব্রজনাথ পরদিন তাঁহাকে ভিজিট্ ও ঔষধের টাকা দিতে স্বীকৃত হইল।

খানিক রাত্রে চেতনা হইলে গিরিশ যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সহিত জমিদারের বিবাদ চলিতেছে। জমিদার

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নামে গাছকাটা, দাঙ্গা, লোকজনকে প্রহার ইত্যাদি অজুহাতে নালিশ করিয়াছেন। সেই মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্ম নায়েব মহাশয় গিরিশকে ডাকাইয়া অনুরোধ করেন। কিন্তু গিরিশ ব্রাহ্মণের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় নায়েব তাহাকে গালাগালি করেন। অসহ্য হইলে গিরিশ তদুত্তরে দুই একটা চড়া কথা শুনাইয়া দেয়। ইহাতে নায়েব ক্রুদ্ধ হইয়া পদাতিকগণের দ্বারা তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করাইয়াছেন। এই ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণে ব্রজনাথের উষ্ণ রক্ত যেন চন্ চন্ করিয়া উঠিল, সে পরদিন সকালে থানায় গিয়া রিপোর্ট লিখাইয়া আসিল, এবং গিরিশকে পাল্কী করিয়া মহকুমায় লইয়া গিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিল।

ব্রজনাথের শুভানুধ্যায়ী বাবুরা বলিল, "ভাল কাজ করলে না ব্রজনাথ, জমিদারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত কথা।"

ব্রজনাথ উত্তর করিল, "আইন, জমিদার ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই সমান। পয়সা আছে ব'লে জমিদারের জন্য আলাদা আইন তৈরী হবে না। মূর্খ প্রজারা ভয় ক'রেই জমিদারের অত্যাচার এত বাড়িয়ে তুলেছে।"

জমিদারের যে বর্ত্তমান অত্যাচার ব্রজনাথের চেষ্টায় দমিত হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও বন্ধুরা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "কিন্তু গিরিশ সরকার বিপক্ষ দলের লোক, তার তরে কেন বৃথা এতটা পরিশ্রম ক'রবে?"

ব্রজনাথ রাগিয়া বলিল, "এক গাঁয়ের লোক; দলাদলি আছে ব'লে সে যদি বিপক্ষ হ'য়ে যায়, তা' হ'লে ভিন্ন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তো কোন সম্বন্ধই থাকে না। আর এই স্বপক্ষ বিপক্ষ নিয়েই তো দেশটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।"

তাহার রাগ দেখিয়া বন্ধুরা নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার এই হিতৈষণাবৃত্তির প্রশংসা করিতে পারিল না। যাহারা প্রশংসা করিল, তাহারা পরিণামে একটা কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নায়েব মুকুন্দ ঘোষ অচিরাৎ এই নালিশের সংবাদ পাইলেন। যাহারা ব্রজনাথের পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিয়াছিল, তাহারাই গিয়া নায়েব মহাশয়কে এই সংবাদ প্রদান করিল। নায়েব শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। মতি হাজরার হাতে লাঙ্গলের কঁড়া পড়ে গিয়েছিল। তার বেটা দু'পাত ইংরাজী প'ড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। কিন্তু আইন আদালত যে কি চিজ্, তা তো বাছাধন এখনও জানে না, এইবার জানবে। হরি হে দীনবন্ধু, পার কর।"

ঐ কথা বলিয়া নায়েব মহাশয় দীর্ঘ জৃম্ভণ ত্যাগপূর্ব্বক অঙ্গুলিদ্বয় সংযোগে তুড়ি দিলেন। পারে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা না থাকিলেও নায়েব মহাশয় প্রায় প্রতি কথার অবসানেই শ্রীহরির চরণে পারের জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়া স্বীয় বিষয়-নিস্পৃহতা প্রদর্শন করিতেন।

এদিকে ব্রজনাথ দলাদলির নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে সে এই কাজটাকে যত সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিল, বাস্তবিক কাজটা তত সহজ নহে! প্রথমে তাহাকে কেহ আমল দিল না; সকলেই ব্রজনাথের আর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া পাঁচজনের মত লইবার পরামর্শ দিল। কিন্তু সেই পাঁচজন যে কে, বহু চেষ্টাতেও ব্রজনাথ তাহার উদ্দেশ পাইল না। তথাপি সে নিরস্ত হইল না। অনেক কষ্টে গ্রামের মাতব্বরদিগকে একস্থানে সমবেত করিল, এবং তাহাদের সমক্ষে দলাদলি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা, তাহার

সুফল, গ্রামের ও সমাজের উন্নতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিল। তাহার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার মর্ম্ম সকলেরই যে হৃদয়ঙ্গম হইল, তাহা নহে, তথাপি অনেকেই দলাদলি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইলেন। তখন কিরূপে ইহার নিষ্পত্তি হয়, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীপতি ঘোষ বলিলেন, উমেশ দত্তর মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার উপস্থিতির অপেক্ষা না করিয়াই জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভোজন করান হইয়াছিল। এই অপমানের প্রতিকার না হইলে তিনি নিষ্পত্তির কথা কহিতে পারেন না। শিবু হাজরা বলিল, গণেশ দের কন্যার বিবাহে সে মালা পায় নাই, সুতরাং ইহার বিচার হওয়া আবশ্যক। ভৈরব চক্রবর্ত্তী বলিলেন, শিবু হাজরার পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি তাঁহার বিদেশস্থ পুত্রের ছাঁদা পান নাই ; সে ক্ষতির পূরণ না হইলে তিনি কোন কথায় মত দিতে পারেন না। এইরূপে উভয় পক্ষ হইতে যে সকল আপত্তি উত্থিত হইল, সেই সকল আপত্তি সম্বন্ধে বহুক্ষণ বাদানুবাদ চলিতে চলিতে সে দিনের মত সভাভঙ্গ হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে রামজয় মণ্ডল ভৈরব চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওনা এত হাত পা নেড়ে কি বল্লে বাবাঠাকুর ?"

বাবাঠাকুর উত্তর করিলেন, "বল্‌লে মাথা আর মুণ্ডু। গাঁয়ের লোকগুলাকে খিরিষ্টান্ ক'র্‌বার মতলব।"

দারুণ ভীতিতে শিহরিয়া রামজয় বলিল, "বল কি বাবাঠাকুর, খিরিস্তান্ কর্‌বে ?"

বাবাঠাকুর একটু কুটিল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "শুধু তাই ? বিধবার বিয়ে দেবে, নমাজ পড়াবে, আর সেই যার নাম কত্তে নাই, তাই সক্কলকে খাওয়াবে।"

ভীতিবিমিশ্রস্বরে রামজয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি খাওয়াবে ? গরু ?"

"রামচন্দ্র রামচন্দ্র !" বলিয়া বাবাঠাকুর ঘন ঘন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

দলাদলি কিছুতেই মিটিল না। ভৈরব চক্রবর্ত্তীর ন্যায় কতকগুলি লোক আছে। দলাদলিই যাহাদের পেশা, দলাদলি মিটিয়া গেলে তাহাদের আর কোন কাজ থাকে না,—বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা মোকদ্দমা বাধে না; মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য লোকে তাহাদের শরণাপন্ন হয় না; মোটের উপর তাহাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং আর্থিক লাভের উপায় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং যাহাতে দলাদলি না মিটে ইহাই তাহাদের চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে ব্রজনাথের প্রাণান্ত চেষ্টা পরাভূত হইল; গ্রামের দলাদলি মিটিল না। তবে অনেক লোক ব্রজনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল।

ইহাতে ব্রজনাথের একটা লাভ হইল যে, মধু ঘোষের সহিত তাহাদের যে একটা বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার অবসান হইয়া গেল। ব্রজনাথ নিজে কর্ত্তা সাজিয়া মধু ঘোষের শ্রাদ্ধে আয়োজন করিতে লাগিল। ইহাতে মধু ঘোষের স্বপক্ষীয়গণের আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ হইল না। কেন না তাহারা বুঝিয়াছিল, মধু ঘোষের শ্রাদ্ধটা যেরূপে সম্পন্ন হইত, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ আয়োজনের সহিত সম্পন্ন হইবে। পুরোহিত বামাঠাকুর শ্রাদ্ধের লম্বা ফর্দ্দ দিয়া গেলেন। বৃদ্ধ নিত্যানন্দ ঘোষ ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভোজনের জন্য ঘি ময়দা দই সন্দেশ প্রভৃতি কি পরিমাণে আবশ্যক, তাহা ভাবিয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

প্রবীণাগণ সকালে সন্ধ্যায় মধু ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়া ফর্দ্দের প্রত্যেক জিনিষটী লইয়া বিচারবিতর্ক করিতে লাগিলেন। কেহ পাঁচ সের ময়দা কম করিতে বলিলেন, কেহ বা ময়দা ঠিক রাখিয়া দশ সের আলু কমাইতে পরামর্শ দিলেন, কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিলেন

যে, জিনিষ পত্র কমাইবার প্রয়োজন নাই, তাহাতে অপযশের সম্ভাবনা। বামাঠাকুর ব্রজনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কিছুই কম ক'র্‌বার দরকার নাই। বাবাজী যখন এ কাজে হাত দিয়েছে, তখন দু'পয়সা বেশী কমে কিছুই আটক হবে না।" অতঃপর তিনি ব্রজনাথকে জানাইয়া দিলেন, শ্রাদ্ধের বস্ত্রাদি যেন ব্যবহারযোগ্য হয়, অব্যবহার্য্য দ্রব্যদানে ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়। স্বীয় উক্তির প্রমাণের জন্য তিনি দুই একটা সংস্কৃত শ্লোক অসংস্কৃত করিয়া আবৃত্তি করিলেন। ব্রজনাথ ঈষৎ হাস্য-সহকারে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিল।

ব্রজনাথ রাজুর গহনাগুলা লইয়া আমোদিনীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং গহনাগুলা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই গহনাগুলো রেখে চার শো টাকা দাও তো নতুন মা।"

আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার গয়না রে ব্রজ?"

ব্রজনাথ বলিল, "রাজুর গয়না।"

আমো। গয়না বাঁধা দিয়ে বুঝি বাপের শ্রাদ্ধ কর্‌বে?

ব্রজ। কাজেই।

আমোদিনী গয়নাগুলোকে নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু এই কখানা গয়না রেখে তো চার শো টাকা দেওয়া যায় না বাছা।"

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিতে পার?"

আমো। জোর দু'শো।

ব্রজ। বেশ। আর দু'শো না হয় শুধু হাতেই ধার দাও।

আমো। শুধু হাতে বিনা জামিনে আমি টাকা দিতে পার্‌বো না।

ব্রজ। আমি যদি জামিন থাকি?

আমো। তা হ'লে দিতে পারি।

ব্রজ। বেশ, আমাকেই জামিন রেখে টাকা দাও।

আমোদিনী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তবে তোকে জামিন রেখে চার-শো টাকাই দিচ্ছি। গয়নাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যা।"

তিনি গহনাগুলা ফিরাইয়া দিয়া চারিশত টাকা ব্রজনাথকে আনিয়া দিলেন।

ব্রজনাথ টাকা পাইল বটে, কিন্তু গহনাগুলা লইয়া একটু মুস্কিলে পড়িল। সেগুলা রাজুর নিকট ফিরাইয়া দিতে তাহার সাহস হইল না, অথচ সেগুলাকে কোথায় রাখিবে তাহাও ভাবিয়া পাইল না। অনেক ভাবিয়া শেষে আমোদিনীকে বলিল, "এগুলো এখন রেখে দাও নতুন-মা, এক সময় নিয়ে যাব।"

বলিয়া সে টাকা লইয়া চলিয়া গেল। আমোদিনী মনে মনে হাসিয়া গহনাগুলা তুলিয়া রাখিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে নিত্যানন্দ ঘোষ ব্রজনাথকে বলিলেন, "তোমার কল্যাণে সেই সব হ'লো ভায়া, শুধু একটু খুঁত র'য়ে গেল।"

আশঙ্কার সহিত ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুঁত রইলো দাদামশায়?"

নিত্যানন্দ বলিলেন, "গ্রামের ক'টা ঘর মাত্র বাদ রইলো।"

ব্রজনাথ বলিল, "কি কর্‌বো বলুন, তাঁরা তো কিছুতেই আসতে চাইলেন না।"

নিত্যানন্দ বলিলেন, "তারা আসতে চায়, কিন্তু এর মূল হচ্চে ঐ ভৈরব চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তীই তো পাক দিয়ে মেটাতে দিলে না।"

ব্রজনাথও তাহা জানিত; সুতরাং উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। ঘোষজা বলিলেন, "কিন্তু বামুন অনেকটা সোজা হ'য়ে এসেছে। কাল দেখা হ'য়েছিল, অনেক কথাই হ'লো। ওর আসল আপত্তিটা কি জান, সেই শিবু হাজরার বাড়ীর ছাঁদা। তা এর দরুণ একটা টাকা সম্মান দিলেই বোধ হয় মিটে যায়।"

এই সামান্য বাধা দূর হইলেই দলাদলি মিটিয়া যায় শুনিয়া ব্রজনাথ তজ্জন্য আগ্রহান্বিত হইল, এবং চক্রবর্ত্তীকে সম্মান দিয়া মিটাইয়া ফেলিতে ঘোষজাকে অনুরোধ করিল। ঘোষজা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন, তবে একটু কিন্তু রাখিয়া বলিলেন, "কিন্তু ভায়া একটা কথা, চক্রবর্ত্তীকে সম্মান দিলে আর সকলে যদি সম্মানের দাবী ক'রে বসে।"

ব্রজনাথ চিন্তিত হইল। ঘোষজা কিছুক্ষণ ভাবিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধীয়তে; আগে তো দলাদলিটা মিটে যাক্। সম্মানের কথাটা গোপনে রাখলেই চল্‌বে।"

তদনুসারেই কাজ হইল। দলাদলি মিটিয়া গেল, এবং তজ্জন্য নিমন্ত্রিতের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ায় আয়োজনও কিছু বাড়াইতে হইল। কিন্তু সম্মানের কথাটা গোপনে রহিল না; ব্রাহ্মণ-ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সমাগত ব্রাহ্মণেরা ধরিয়া বসিলেন, "ভৈরব চক্রবর্ত্তী যখন সম্মান পাইয়াছে, তখন তাঁহারাও সম্মান পাইবার অধিকারী, এবং তাহা না পাইলে তাঁহারা এখানে জলগ্রহণ করিবেন না।"

ব্রজনাথ প্রমাদ গণিল। ঘোষজা ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে বাদানুবাদের ফল কিছুই হইল না। লাভের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং সম্মান না পাইলে সে স্থানে জলগ্রহণ করিবেন না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজনাথ কি করিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না। সে শুধু কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠিক্ সেই সময় একখানা পাল্কী আসিয়া দরজায় থামিল। ব্রজনাথ বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে দেখিল, আমোদিনী পাল্কী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যেই প্রবেশ করিলেন।

একটু পরেই ভিতর হইতে ব্রজনাথের ডাক আসিলে ব্রজনাথ লজ্জানত-মস্তকে গিয়া আমোদিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল। আমোদিনী বলিলেন, "একি কর্‌লে ব্রজ?"

ব্রজনাথ উত্তর করিল, "আমি আগে বুঝ্‌তে পারি নাই নতুন-মা।"

মৃদু হাসিয়া আমোদিনী বলিলেন, "আমি তো তখনই বলেছিলাম বাছা।"

ব্রজনাথ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমোদিনী বলিলেন, "এখন কি কর্‌বে ভাবছ?"

ব্রজনাথ বলিলেন, "ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পারি নাই। প্রত্যেককে সম্মান দিতে হ'লে প্রায় একশো টাকা দিতে হয়।"

আমো। ব্রাহ্মণ সব চলে গিয়েছে?

ব্রজ। কতক গিয়েছে, কতক যাবার উদ্যোগ কচ্ছে।

আমো। যারা গিয়েছে, তাদের ডাকাও! যারা যায় নাই তাদের বসাও।

ব্রজ। তার পর?

আমো। তারপর ব্রাহ্মণদের বল, প্রত্যেকেই একটাকা করে সম্মান পাবেন।

ব্রজনাথ নীরবে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। আমোদিনী সহাস্যে বলিলেন, "আর এই টাকাটা পাগলামির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকেই দিতে

হবে। তোমার নামে হাওলাত খাতে খরচ লিখে, আমি আপাততঃ দিচ্ছি।"

ব্রজনাথ একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "তুমি আজ বড্ড মান বাঁচালে নতুন-মা।"

আমোদিনী বলিলেন, "এটা তোর মান বাঁচালাম না ব্রজ, মান বাঁচালাম সেই হাজরা বুড়োর। তার ছেলে তুই, একটা কাজে হাত দিয়ে যদি সেটা উদ্ধার করতে না পারিস্, তবে লোকে বল্‌বে, ফলনা হাজরার ছেলে বদ্ধ পাগল। আমি বেঁচে থাকতে সেটা শুন্‌তে পারব না, ব্রজ।"

বলিয়া তিনি একশত টাকা গণিয়া ব্রজনাথের হাতে দিলেন। ব্রজনাথ টাকাগুলা লইয়া নিঃশব্দে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময় বিরাজ আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং গ্রীবা উন্নত করিয়া রোষদীপ্ত-স্বরে বলিল, "তোমাকে এতটা কত্তে কে বলেছে, বেজো-দা?"

পথিমধ্যে সহসা উদ্যতফণা ফণিনী-দর্শনে লোকে যেমন সভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া দাঁড়ায়, বিরাজের ক্রোধরুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রজনাথও তেমনি ভয়ে এক পা পিছাইয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

আমোদিনী ধীর গম্ভীর পদে আসিয়া বিরাজের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং তাহার মাথায় নিজের হাতখান রাখিয়া হাস্যপ্রফুল্লস্বরে বলিলেন, "পরকেই ব'লে কাজ করাতে হয়, কিন্তু আপনার লোক যে, সে তো বলা কওয়ার অপেক্ষা রাখে না মা!"

তাঁহার হাস্যগম্ভীর মুখের দিকে চাহিতেই বিরাজের রোষদীপ্ত দৃষ্টি আপনা হইতেই নত হইয়া আসিল। মুক্তি পাইয়া ব্রজনাথ ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ধাক্কা খাইলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে না, এবং যে দিক্ হইতে ধাক্কা আসিয়া লাগে, সে দিক্‌টাকে পরিহার করিয়া চলিতে চায় না। বরং ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া আপনার কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করিয়া লইতে ভালবাসে। ব্রজনাথের প্রকৃতিও অনেকটা এইরূপ ছিল। সুতরাং মধু ঘোষের শ্রাদ্ধে একটা ধাক্কা খাইয়াই সে অবসন্ন হইয়া পড়িল না বা ঈর্ষা-দ্বেষ-পরায়ণ গ্রামের লোক-গুলার উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদের সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে ইচ্ছুক হইল না; বরং এই ঈর্ষা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত লোকগুলার মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্রেক করিয়া দিয়া কিরূপে সমাজটাকে উন্নতির পথে চালিত করিতে পারা যায়, তাহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইল।

এ দিকে গিরিশ সরকারের মোকদ্দমার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধের গোলোযোগে ব্রজনাথ সেদিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ পায় নাই। শ্রাদ্ধ শেষ হইলে সে গিরিশ সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিল। গিরিশ তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ব্রজ-নাথের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমার ধার জীবনে শুধ্‌তে পার্‌বো না, বাবাজি। সেদিন তুমি এসে না প'ড়্‌লে আমি তো মারাই যেতাম।"

ব্রজনাথ বলিল, "ভগবান্ রক্ষা-কর্ত্তা, তিনিই কোন না কোন উপায়ে রক্ষা করেন।"

সক্ষোভে গিরিশ বলিল, "ভগবান্ ব'লে কেউ আছে তা' তো মনে হয় না। থাকলেও তিনি প্রবলের বন্ধু, দুর্ব্বলের কেউ নয়।"

ব্রজনাথ বলিল, "এটা লোকের ভুল ধারণা। ভগবান্ প্রবল-দুর্ব্বল, ধনী-নির্ধন সকলেরি সহায়। ভগবান্ নিজে গীতায় ব'লেছেন—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।' ভগবানের প্রিয় অপ্রিয় কেউ নাই, তাঁর কাছে সকলেই সমান। আমরা কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করি।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া গিরিশ বলিল, "সুখটা কথার কথা, দুঃখটাই ভোগ ক'রে যাই। সুখটা—যাঁরা প্রবল, তাঁদেরি একচেটে।"

প্রবলের অত্যাচারে ক্ষুব্ধচিত্ত গিরিশকে সান্ত্বনা দিয়া ব্রজনাথ বলিল, "দেখুন সরকার মশাই, ন্যায় অন্যায় এ দু'টো সকল মানুষের ভেতরেই আছে, কাজেই সংসারে শুধু ন্যায়টাকে দেখ্‌বার আশা ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না। তবে অন্যায় যেমন আছে, তার প্রতিরোধের উপায়ও তেমনি রয়েছে। এই জন্যই এত আইন আদালত দণ্ডবিধি শাসনবিধির সৃষ্টি। প্রবল চিরকালটা অন্যায় ক'রে আস্‌ছে, আর দুর্ব্বল যে, সে আপনাকে অক্ষম বুঝে রাজ-শক্তির সাহায্যে সেই অন্যায়কে দমন ক'চ্চে।"

চিন্তা-মলিন-মুখে গিরিশ বলিল, "কিন্তু আইন-আদালতের সাহায্যে অন্যায়কে দমন করা বড় সহজ কথা নয়। তা'তে পয়সার জোর চাই, লোক-বল থাকা চাই। আমি কাল কি খাব তার সংস্থান নাই, অথচ জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা চালাব; এটা আমার পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

উত্তেজিতভাবে ব্রজনাথ বলিল, "পয়সা নাই ব'লে কি এতবড় অন্যায়-টাকে সয়ে যেতে হবে? যে উপায়ে হোক্ এর প্রতিবিধান করা দরকার।"

গিরিশ বলিল, "কি উপায় ক'র্‌বো বাবাজি? এক উপায়—ঋণ।

কিন্তু ঘরে যার বারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে, সে কোন্ সাহসে ঋণ ক'রে মোকদ্দমা চালাবে ?"

এ কথায় ব্রজনাথকে নিরুত্তর হইতে হইল; এবং উপস্থিত মোকদ্দমাটার কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, এ কাজে যখন হাত দিয়াছে তখন নিজ হইতেই টাকা দিয়া মামলা চালাইবে। ব্রজনাথ নিজে গিয়া দুইজন বড় উকিল নিযুক্ত করিয়া আসিল।

মোকদ্দমার দুই দিন আগে নায়েব মুকুন্দ ঘোষ ব্রজনাথকে একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইল। সে অনুরোধ উপেক্ষা করা অভদ্রতা জ্ঞানে ব্রজনাথ সেই দিন অপরাহ্নে নায়েব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য কাছারীতে উপস্থিত হইল। কাছারীতে তখন সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত বিস্তর প্রজা উপস্থিত হইল। নায়েব মহাশয় তাহাদের মধ্যস্থলে নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রদেবের ন্যায়, বন্য লতাগুল্মের মধ্যদেশে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় স্বতন্ত্র আসনে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। পাশে ভিন্ন আসনে বসিয়া গোমস্তা মুহুরী সেহা চিঠা প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিল। এমন সময় ব্রজনাথ তথায় উপস্থিত হইলে, নায়েব মহাশয় ব্যস্ততা-সহকারে তাকিয়া ছাড়িয়া, হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া "এস বাবাজি" বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ব্রজনাথ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রজাদের আসনে বসিতে গেলে তাহার হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। সমাগত প্রজাবৃন্দ কতকটা বিস্মিত, কতকটা ঈর্ষান্বিত নেত্রে ব্রজনাথের এই সৌভাগ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ব্রজনাথকে বসাইয়া তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর সে এক্ষণে কি করিতেছে, এবং ভবিষ্যতে কি করিবে স্থির করিয়াছে, নায়েব মহাশয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং ব্রজনাথ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার

পূর্ব্বেই তিনি সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দেখ্‌ছো এই ছোক্‌রা, এই যে ছিপ্‌ছিপে চেহারা, এর পেটে বিদ্যে কত জান? বিদ্যের জাহাজ; এত বড় বিদ্বান্‌ এ গাঁয়ে কেউ কখন হয় নি, হবেও না। এ আজ যদি মনে করে, কাল গিয়ে তোমাদের ওই ভবানীপুর মহকুমায় বড় ডিপুটীর বেঞ্চিখানা কেড়ে নিতে পারে।"

বলিয়া তিনি ব্রজনাথের মুখের উপর স্বীয় প্রশংসমান দৃষ্টি স্থাপিত করিলেন। ব্রজনাথ লজ্জায় মস্তক নত করিল। নায়েব মহাশয় তখন কেশবিরল মস্তক আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু একটা বিষয়ে তুমি আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করেছ বাবাজি; এত ইংরাজী শিখে কি ক'রে এই বনের ভিতর ব'সে আছ? বন ব'ল্‌বো না তো কি ব'ল্‌বো? না আছে রাস্তা ঘাট, না আছে মানুষের মত মানুষ, না আছে সভ্যতা ভব্যতা। আছে শুধু বন-বাদাড়, পানাপুকুর, আর ঝগড়া বিবাদ। আজকালকার ছেলেরা এ বি সি ডি কপ্‌চাতে শিখ্‌লেই পাড়াগাঁয়ের নামে নাক সেঁট্‌কায়, আর তুমি এলে বিএ পাশ ক'রে সেই পাড়াগাঁয়ে এসে ব'সে আছ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!"

নায়েব মহাশয়ের এই আশ্চর্য্যজনক উক্তির উত্তরে ব্রজনাথ সবিস্ময়ে জানাইল যে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, শিক্ষিত হইলেই যে সহরবাসী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য আপনার ও দেশের মঙ্গল-সাধন। শিক্ষালাভ করিয়া সহরবাসী হইলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যায়। হইতেছে তাহাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোযোগের অভাবে দেশ ক্রমেই উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে। সুতরাং দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পল্লীবাস অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রজনাথের এই দেশহিতৈষিতা শ্রবণে সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

নায়েব মহাশয় সাহ্লাদে মস্তক সঞ্চালন করিয়া হর্ষগদগদ-কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, মতি ভায়ার উপযুক্ত পুত্র বটে! আহা, মতি ভায়া কি একটা যে সে লোক ছিল? আপদে বিপদে, যুক্তিতে পরামর্শে আমার ডান হাত ছিল ব'ল্‌লেই হয়। সে যেদিন মারা যায়, আমি মনে ক'র্‌লাম, আমার ডান হাতখানা ভেঙ্গে গেল।"

নায়েব মহাশয়ের মুখ-মণ্ডলে বেদনার গভীর চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি সশব্দে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। অতঃপর তিনি ব্রজনাথের দিকে সরিয়া বসিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "তোমাকে কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি বাবাজি, তুমি আর যাই কর, লোকের কথায় থেকো না, কারো কথায় মামলা মোকদ্দমায় হাত দিও না। তুমি ছেলে-মানুষ, এ গাঁয়ের লোকদের চেন না; এরা সাপ হ'য়ে খায়, রোজা হ'য়ে ঝাড়ে। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিতে এমন বাহাদুর লোক আর ভূ-ভারতে নাই। এরা সাম্‌নে তোমাকে বাবা ব'ল্‌বে, কিন্তু পেছনে ফিরেই শালা ব'ল্‌তে ছাড়্‌বে না। খুব সাবধান বাবাজি, খুব সাবধান।"

নায়েব মহাশয়ের এই অযাচিত উপদেশ ব্রজনাথ সসম্মানে শিরোধার্য্য করিয়া লইল, এবং আর দুই চারি কথার পর বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে গিয়া সে নায়েব মহাশয়ের এই সদুপদেশের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

সে চলিয়া গেলে নায়েব মহাশয় গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন, "ছোক্‌রা লেখাপড়া এক আধটু শিখেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি একটুও নাই। তা' নইলে কি লেখাপড়া শিখে এই বনে এসে ব'সে থাকে? যেমনই হোক্, মতি হাজরার ছেলে তো বটে! বাপ গুণে বেটা। আঁস্তা কুড়ের পাতা কি স্বর্গে যায়? সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা!"

উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে নায়েব মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করিল। যাহারা অন্তরের সহিত সায় দিতে পারিল না, তাহারাও দিন কতক পরে ব্রজনাথকে গিরিশ সরকারের মোকদ্দমায় ব্যস্ত দেখিয়া আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিল। বাস্তবিক বুদ্ধির অল্পতা না থাকিলে কেহ কি জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হয়? জমিদারের অধীনে বাস করিয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত বিরোধ, আর জলে থাকিয়া কুম্ভীরের সহিত বাদ যে একই কথা!

স্বীয় উপদেশ নিষ্ফল হইল দেখিয়া নায়েব মহাশয় যেমন ক্ষুব্ধ হইলেন, তেমনই এই নির্ব্বোধ যুবককে শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গিরিশ সরকারের পক্ষ হইতে যাহাদিগকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, যদি স্ত্রীপুত্র লইয়া গ্রামে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহারা যেন কোন পক্ষে যোগ না দেয়। সাক্ষীরা নিরপেক্ষভাবে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইল। ব্রজনাথ সাক্ষীদের দরজায় দরজায় ঘুরিয়া এবং নায়েবের অবাধ অত্যাচার দমনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াও কাহাকেও সম্মত করিতে পারিল না। সকলেই বলিল, "জমিদারের কোপে পড়ে শেষে কি প্রাণে মারা যাব! জমিদারের আড়ি বাঘের আড়ি।"

সারা গ্রামের মধ্যে শুধু একটী লোক সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল, সে লোকটী হরি-খুড়ো। যে নায়েবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গ্রামের ভদ্র অভদ্র কেহই সম্মত হইল না, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়ের বিরুদ্ধে হরি-খুড়ো যে সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইল, তাহার একটু কারণ ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

হরি-খুড়ো ওরফে হরিচরণ চক্রবর্ত্তী চাঁদা-মামার মত গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেরই খুড়ার স্থান অধিকার করিয়াছিল; পিতা-পুত্র উভয়েই একত্রে তাহাকে হরি-খুড়ো বলিয়া আহ্বান করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না; হরি-খুড়োও ইহাতে কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করিত না; বরং এই সার্ব্বজনীন খুল্লতাত সম্বোধনে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিত। এজন্য অনেকে তাহাকে মাথা-পাগ্‌লা বলিত।

লোকের এই ধারণাটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন এমন কথা বলা যায় না; বাস্তবিকই হরি-খুড়োর মস্তিষ্ক-যন্ত্রটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না; অনেক সময় তাহার কথায় বা কার্য্যে এই অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইত। তবে এটা সত্য যে, হরি-খুড়োর মস্তিষ্ক-যন্ত্রটা চিরদিনই এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না; কর্ম্মকারের আঘাতের পর আঘাতে কঠিন লোহাটাও যেমন বিকৃত হইয়া যায়, সংসারের কঠিন নিষ্পেষণে হরি-খুড়োর মস্তিষ্কও সেইরূপ কতকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

শৈশব হইতেই হরিচরণ সংসারের নিকট আঘাতের পর আঘাত পাইয়া আসিতেছিল। শৈশবের অজ্ঞান অবস্থা অতিক্রম করিয়া সে যখন জ্ঞানের পথে পদার্পণ করিল, তখন সে দেখিল, সংসারটা খুব বিশাল এবং অগণ্য জীবে ভরা হইলেও সেই জনতাপূর্ণ সংসারে এমন একটী লোক নাই যাহাকে সে আপনার বলিতে বা যাহার নিকট হইতে এক বিন্দু স্নেহ-মমতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। একটা গোবৎস-মাতা সস্নেহে তাহারও গাত্র লেহন করে; একটা ক্ষুদ্র পক্ষিশাবক—পক্ষিমাতা ক্ষুদ্র

চঞ্চুপুটে খাদ্য লইয়া তাহারাও মুখে ঢালিয়া দেয়। কিন্তু উচ্চতর জীব মানুষ সে, তাহাকে স্নেহ করিবার বা তাহাকে এক মুঠা খাইতে দিবার কেহই নাই। মা-বাপ, ভাই-বোন্ তো নাই; এ সকল ছাড়া অন্য আত্মীয় অভিভাবক এমন কেহই নাই, যাহাদের উপর সে একটুও স্নেহের দাবী করিতে পারে। থাকিবার মধ্যে ছিল এক বুড়া পিসী। কিন্তু সেই রুক্ষ-স্বভাবা শুচিবায়ুগ্রস্তা পিসীমার নিকট হইতে স্নেহ-মমতা অপেক্ষা তাড়না এত বেশী পাইত যে, হরিচরণ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, এই কঠোর তাড়নার মধ্য দিয়া সে কিরূপে সুকোমল বাল্য-জীবনটা অতিক্রম করিয়া আসিল।

কঠোরতায় যে প্রভাতের সূচনা, মধ্যাহ্নে তাহার চরম পরিণতি হইল। বছর বারো বয়সের সময় বৃদ্ধা পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাড়নার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার মহাযাত্রার পর নিঃসঙ্গ হরিচরণ তাড়না-পরায়ণা পিসীমার অভাব অনুভব করিয়া একটু কাতর হইল। কিন্তু সে কাতরতা স্থায়ী হইল না; দিন কতক বাধ বাধ ঠেকিবার পর সব সহিয়া গেল। তবে একটা বিষয়ে বড় গোল বাধিল, এক মুঠা রাঁধিয়া দিবার কেহ রহিল না। অগত্যা সে এ বাড়ী সে বাড়ী খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ বাড়ী সে বাড়ীর মধ্যে দুইটা বাড়ী ছিল; এক জ্ঞাতি ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বাড়ী, আর এক পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী রামজয় আকুলির বাড়ী। তবে ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বাড়ী অপেক্ষা আকুলি মহাশয়ের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ খাওয়া হইত। কেন না, উপর্য্যুপরি দুই দিন ভাত দিলেই তিন দিনের দিন হরিচরণ উপস্থিত হইলে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী প্রায়ই বলিতেন, "ঐ দেখ্, আজ যে তোর চাল নিতে ভুলে গিয়েছি রে।"

অন্ন-প্রাপ্তির আশায় হতাশ হইয়া হরিচরণ কিয়ৎক্ষণ ম্লানমুখে বসিয়া

থাকিত; তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া আকুলিদের দরজায় উপস্থিত হইত। তাহাকে দেখিয়াই রামজয় আকুলির সাত বছরের মেয়ে মিনি বলিয়া উঠিত, "ঐ গো মা, হলি এয়েছে।"

আকুলি মহাশয়ের গৃহিণী হরিচরণের ম্লান-মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "কিরে হরি, তোর খাওয়া হয় নি?"

নতমুখে হরিচরণ উত্তর করিত, "না, জ্যেঠাই-মা, আজ ওরা আমার চাল নিতে ভুলে গিয়েছে।"

জ্যেঠাই-মা তাড়াতাড়ি বলিতেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি বেশী চাল নিয়েছি, আয়।"

এইরূপে বছর দুই কাটিয়া গেলে একদিন ভৈরব চক্রবর্ত্তী হরিচরণকে ডাকিয়া কহিলেন, "হরি, চিরদিন কি পরের খেয়ে বেড়াবে? পরেই বা কত দিন তোমাকে অন্ন যোগাবে? ডাগরটী হ'য়েছ, নিজে এক মুঠো ফুটিয়ে খেতে পার না?"

হরিচরণও বুঝিল মন্দ কথা নয়। অতঃপর সে নিজেই রাঁধিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দিন কতক একটু বাধ বাধ ঠেকিল, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেল। বিশেষ রন্ধনকার্য্যে একজন সহকারী পাওয়ায় তাহার পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হইত। সে সহকারী রামজয় আকুলির মেয়ে মিনি। হরিচরণের রন্ধনের সময় সে প্রায়ই তথায় উপস্থিত হইত, এবং তাহার বয়স নয় বৎসরের অধিক না হইলেও সে ঠিক ত্রিশ বৎসরের মেয়ের মতই হরিচরণকে রন্ধনকার্য্যে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিত। হরিচরণ উনান ধরাইতে অকৃতকার্য্য হইলে মিনি অগ্রসর হইয়া বলিত, "চল, আমি দেখি।"

বলিয়া সে উনানে কাঠ ঘুঁটে গুঁজিয়া দিয়া ফুৎকার প্রদান করিতে থাকিত, কিন্তু মুহুর্মুহুঃ ফুৎকারেও উনানটা যখন প্রজ্বলিত না হইয়া শুধু

অজস্র ধূম উদ্গীরণে তাহার চোখ দুইটাকে আরক্ত ও বাষ্পসজল করিয়া দিত, তখন মিনি রাগে বাঁশের চোঙ্গাটা ফেলিয়া সরিয়া আসিত, এবং দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উনানের মুখে অগ্নি-সংযোগের ব্যবস্থা করিত। হরিচরণ তাহার অবস্থা দর্শনে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া নিজে উনান ধরাইতে যাইত।

হরিচরণ রাঁধিত, মিনি তাহার পাশে বসিয়া কুট্না কুটিত, বাট্না বাটিত, কলসী তুলিবার সামর্থ্য না থাকায় পুকুর হইতে ঘটী করিয়া জল আনিয়া দিত। হরিচরণ ভাতে-ভাত রাঁধিয়া রন্ধনকার্য্য শেষ করিতে ইচ্ছুক হইত, মিনি জোর করিয়া তাহাকে তরকারী রাঁধিতে অনুরোধ করিত, এবং কোন্ তরকারীতে কোন্ বাট্না, কতটা লুন দিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিত। ঝোলের আলুগুলা আগে ভাজিয়া লইতে হয়, মাছগুলা পুড়িয়া গেলে তেঁতো হইয়া যায়, কাঁচা তেলে সাঁত্লাইলে তরকারীতে গন্ধ ছাড়ে, ইত্যাদি বিষয়ে সে এরূপ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিত যে, কোন বর্ষীয়সী পাকা গৃহিণীও তাহার এই সকল সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিত না।

রন্ধন শেষ হইলে হরিচরণ দুই জনের ভাত বাড়িয়া মিনিকে খাইতে অনুরোধ করিত। কোন দিন মিনি বিনা প্রতিবাদে খাইত, কোন দিন বা প্রতিবাদ করিয়া বলিত, "তুমি বেটা-ছেলে হাত পুড়িয়ে রাঁধ্বে, আর আমি রোজ রোজ খেতে যাব কেন বল তো? আমি খাব না!"

হরিচরণ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত যে, পুরুষ-মানুষের রান্না সেই মেয়ে-মানুষকে খাইতে নাই, যে মেয়ে পুরুষকে রাঁধিয়া দিতে সমর্থ; কিন্তু মিনির যখন সে ক্ষমতা নাই, তখন সে অসঙ্কোচে বেটা-ছেলের রান্না খাইতে পারে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। মিনি কিন্তু সব দিন বুঝিত

না। যে দিন বুঝিত, সেদিন খাইতে বসিত, যে দিন বুঝিত না, সেদিন গোঁ-ভরে বাড়ী চলিয়া যাইত।

রান্নাটাও সব দিন সমান হইত না। কোন দিন তরকারীটা লুনে পুড়িয়া যাইত, কোন দিন বা লুনের ভাগ কম হইয়া একমাত্র ব্যঞ্জনকে বিস্বাদ করিয়া দিত। তখন মিনি হরিচরণকে, এবং হরিচরণ মিনিকে এজন্য দোষী করিতে থাকিত; শেষে দোষটা উভয়েরই বুঝিয়া উভয়েই খাইতে খাইতে হাসিয়া লুটোপুটি খাইত। কোন প্রকারে আহার শেষ হইলে মিনি উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কৃত করিয়া, বাসন মাজিয়া দিয়া ঘরে যাইত।

তাহাদের পরস্পর এই আনুগত্য দর্শনে রামজয়ের খুড়ী তাহাদিগকে বর ক'নে বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং মিনির মাকে বলিতেন, "ও ছোট-বৌ, তোর মিনি স্বয়ম্বরা হ'য়েছে, হরিকেই ও বিয়ে কর্‌বে।"

মিনির মা হাসিয়া উত্তর করিতেন, "বেশ তো খুড়ী-মা, হরি তো মন্দ ছেলে নয়।"

পরিহাসচ্ছলে কথিত হইলেও এই কথায় হরিচরণের প্রাণে যে একটা আশা জাগিয়া উঠিত, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। না জানিলেও মিনি যে ভবিষ্যতে তাহারই গৃহিণী হইবে, হরিচরণ নিঃসঙ্কোচে এই আশাটা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল, এবং তাহার এই ঘরখানা ও ঘরের জিনিসপত্র যা কিছু, সকলেই যে তাহার মত মিনিরও অধিকার আছে, অনেক সময় কথায়-বার্ত্তায় মিনির নিকট সে এই ভাবটা প্রকাশ করিত। এই লুব্ধ আশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া হরিচরণ সময়ে সময়ে খোরাকীর ধান বেচিয়া মিনিকে একখান পাছাপেড়ে কাপড় বা এক জোড়া চাঁদের আলো চুড়ী, অথবা দুই হাত জরির ফিতা কিনিয়া দিত। মিনির মা ইহাতে আপত্তি দেখাইলে সে অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিত, "মিনি কি আমার পর, জ্যেঠাই-মা!"

মেয়ের উপর হরিচরণের এই ভালবাসা দেখিয়া মিনির মা আহ্লাদের হাসি হাসিতেন। এমনি আশা ও আনন্দের মধ্য দিয়া দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল।

তার পর রামজয় মেয়ের বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। মিনির মা প্রস্তাব করিলেন, হরিচরণের সহিত মিনির বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। শুনিয়া রামজয় হাসিয়া বলিলেন, "দূর, সগোত্র যে।" মিনির মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অগত্যা নিরস্ত হইলেন। হরিচরণ কিন্তু ইহা জানিল না।

হরিচরণ হঠাৎ একদিন দেখিল, মিনিদের চণ্ডীমণ্ডপে দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে মিনি জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। অপরিচিত লোকের সম্মুখে মিনির এরূপে বসিয়া থাকিবার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হরিচরণের বিলম্ব হইল না; তাহার বুকের রক্তটা যেন জল হইয়া গেল। সে ছুটিয়া মিনির মার কাছে গিয়া শঙ্কা-কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরা কে এসেছে, জ্যেঠাই-মা?"

জ্যেঠাই-মা তখন আগন্তুক ভদ্রলোকদিগের চর্ব্ব্যচোষ্য আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। হরিচরণের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, "ওদের চাঁপা-ডাঙ্গায় বাড়ী, মিনিকে দেখ্‌তে এয়েচে।"

সহসা একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা হইতে গড়াইয়া পড়িলে নিশ্বাসটা যেমন রুদ্ধ হইয়া আসে, ঠিক সেই মত রুদ্ধ নিশ্বাসে হরিচরণ জ্যেঠাই-মার উত্তরটা শুনিল। শুনিবামাত্র তাহার মুখখানা ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল; সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। এই অবসাদটা সাম্‌লাইবার জন্য হরিচরণ রান্না-ঘরের খুঁটাটা চাপিয়া ধরিল। রন্ধন-শালার ভিতর হইতে মিনির মা বলিলেন, "আজ তুই এখানে থাবি, হরি।"

কাঁপা-গলায় হরিচরণ উত্তর করিল, "আমার জ্বর হ'য়েছে, জ্যেঠাই-মা।"

—বলিয়া সে সত্যই যেন জ্বরাক্রান্ত রোগীর ন্যায় টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল, এবং আপনার ঘরে গিয়া :শুধু তক্তাপোষখানার উপর ধুম্ করিয়া শুইয়া পড়িল; বিছানাটা পাতিয়া লইতেও প্রবৃত্তি হইল না।

দিনের আলো ঠেলিয়া দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল; নিবিড় অন্ধকারে ঘরখানা ঢাকিয়া গেল। হরিচরণ উঠিল না, আলো জ্বালিল না; যেমন পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল। বাহিরে ঝিল্লী ডাকিতে লাগিল; উঠানে পেয়ারা গাছের ডালে বসিয়া একটা পেঁচা বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল; রাস্তা দিয়া কে গাহিতে গাহিতে গেল—

এত সাধের বাগান আমার, ফুট্‌লো না কো ফুল।

হরিচরণের দ্রুতস্পন্দিত বুকের ভিতর হইতে আকুল প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল—আমার ফুট্‌লো নাকো ফুল।

হরিচরণ উপুড় হইয়া হাত দুইটার ভিতর মুখখানা গুঁজিয়া দিল।

সকালে মিনি দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "ওমা, এখনো যে শুয়ে? ঘুমুচ্চো নাকি?"

হরিচরণ মুখ তুলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং মিনির মুখের উপর শূন্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই খল্ খল্ শব্দে হাসিয়া উঠিল। মিনি সভয়ে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই দিন হইতে হরিচরণের মাথাটার ভিতর কেমন গোলমাল হইয়া গেল। কেহ বলিল, মাথা গরম হইয়াছে ; কেহ বলিল, বায়ুর প্রকোপ হইয়াছে। কেহ উপদেশ দিল, ঠাণ্ডা জিনিষ মাথায় লাগাও। কেহ বলিল, রাঘবপুরের বদ্যিনাথ কব্‌রেজের কাছে যাও ; কেহ বলিল, মধ্যম-নারায়ণ তেল মাখ। হরিচরণের অসুখের জন্ম আর সকলে অযাচিত উপদেশ দানে ব্যস্ত হইলেও হরিচরণ নিজে কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইল না। সে কবিরাজের কাছে গেল না, বা পানা-পুকুরে ডুব দিয়া গরম মাথাটাকে ঠাণ্ডা করিল না ; হাসিয়া কাঁদিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। দিনও আগেকার মত বেশ সহজভাবে কাটিল না ; কোন দিন খাইয়া, কোন দিন উপবাস দিয়া কাটিল। যে দিন খেয়াল হইত, সেদিন রাঁধিত, খাইত ; যেদিন ইচ্ছা হইত না, সেদিন উপবাসেই কাটাইয়া দিত। কোন দিন হয়তো রান্না চাপাইয়া বাটনা বাটিয়া দিবার জন্ম মিনিকে ডাকিতে ছুটিত, কিন্তু সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আসিত ; কবে যে তাহার বিবাহ হইল, কবে শ্বশুরবাড়ী গেল, তাহা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিত না ; সে স্মৃতিটাকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য সে যতই চেষ্টা করিত, ততই কতকগুলা এলোমেলো ঘটনা মনের চারিপাশে বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত হইয়া মনটাকে নিতান্ত বিভ্রান্ত করিয়া তুলিত। ভাতের হাঁড়ী নির্ব্বাপিত চুল্লীতে বসিয়া থাকিত, আর হরিচরণ দরজায় বসিয়া সেই বিশৃঙ্খল ঘটনাগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকিত। শেষে হয়তো তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ছেলে-মানুষের মত হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

এই ভাবে কতদিন যে অনাহারে হরিচরণের কাটিত, তাহার সংখ্যা নাই। তবে মিনির মা যেদিন জানিতে পারিতেন, সেদিন তিনি হরিচরণকে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। যেদিন তিনি খাওয়াইতেন না, সেদিন আর আহার জুটিত না। রাত্রিতে ক্ষুধার জ্বালা যখন প্রবল হইয়া উঠিত, তখন হরিচরণ হয় বিছানায় পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইত, নয় বাহিরে আসিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিত—

"মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে
চেয়ে দেখ না একটী বার।"

গভীর রজনীতে সুপ্ত পল্লী-প্রকৃতিকে জাগরিত করিয়া তাহার বেসুরা বেতালা কণ্ঠের সেই কাতর ক্রন্দন জগজ্জননীর কর্ণে পৌঁছিত কি না বলা যায় না, কিন্তু প্রতিবাসীরা আকালিক নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিত, "আঃ, হরে পাগলার জ্বালায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাবার যো নাই।"

কিন্তু হরে পাগলার এরূপ পাগলামী চিরদিন রহিল না। সে কোন ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন না হইলেও কালরূপ চিকিৎসক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিনে দিনে যে মৃদু প্রলেপ দিতে লাগিল, তাহাতে বছর দুই তিন পরে তাহার মাথাটা যেন অনেক ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, পাগলামীর ঝোঁক অনেকটা কমিয়া গেল; ক্রমে সেও যে একজন মানুষ, এই সংসারেরই একজন, ইহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিল।

তখন অনেকেই অনুরোধ করিল, "হরিচরণ বিয়ে থা ক'রে সংসারী হও।" সংসারী হইতে হরিচরণেরও যে আপত্তি ছিল তাহা নহে। কেন সে সংসারী হইবে না? সংসারের স্নেহ মমতায় কি তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই? তিন চার বছরে মিনির স্মৃতিটা খুব ক্ষীণ হইয়া

আসিয়াছিল। সুতরাং হরিচরণ বিবাহে কিছুমাত্র আপত্তি দেখিতে পাইল না। তবে আপত্তির মধ্যে চেষ্টা দেখিবার লোকের অভাব। কিন্তু ভৈরব চক্রবর্ত্তী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন সে ভার গ্রহণ করিলেন, তখন হরিচরণ বিবাহের জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়ে সহজে জুটিল না। 'ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু'—অগ্নি-দগ্ধাকে কে সহজে মেয়ে দিতে চায়? তাহার উপর হরিচরণের মস্তিষ্কযন্ত্রের বিকলতা অনেকেরই অগোচর ছিল না। সুতরাং ভৈরব চক্রবর্ত্তীর চেষ্টা-সত্ত্বেও মেয়ে পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। হরিচরণ ইহাতে ম্রিয়মাণ হইল। ভৈরব চক্রবর্ত্তী কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় পরিশেষে পাত্রী জুটিল। কিন্তু তাহাতে হাঙ্গামা একটু ছিল। মেয়ের বাপের এই বিবাহে মত ছিল না, শুধু রাজী ছিল মা আর মামা। তাঁহারা লুকাইয়া মেয়ের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শুনিয়া হরিচরণ বলিল, "শেষে মেয়ের বাপ যদি গোল বাধায়?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "একবার সাত পাক হ'য়ে গেলে গোল ক'রে কি কর্‌বে? বিয়ে তো ফির্‌বে না।"

হরিচরণ আর কোন আপত্তি দেখিল না। পণ চারি শত টাকা স্থির হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি বন্ধক রাখিয়া টাকাটা দিলেন। বিবাহের চার পাঁচ দিন আগে মেয়ে লইয়া মেয়ের মা ও মামা হরিচরণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। এগার বার বছরের মেয়ে; মেয়ের রূপও মন্দ ছিল না। মেয়ে দেখিয়া হরিচরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনির মা আসিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। মিনি তখন পিত্রালয়ে ছিল। সে হরিচরণের গায়ে হলুদ দিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক দল বাজনা আনিয়া দরজায় বসাইলেন।

বাজনার শব্দে, শঙ্খধ্বনিতে, লোকজনের কোলাহলে চির-নির্জ্জন বাড়ীখানা এমনই উৎসবময় হইয়া উঠিল যে, তদ্দর্শনে হরিচরণ নিজেই পুলকজড়িত-বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

যথাসময়ে শুভলগ্নে বর-বেশে সজ্জিত হইয়া হরিচরণ সম্প্রদানস্থলে আসিয়া বসিল। কন্যার মাতা কন্যা-সম্প্রদান করিতে বসিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে গিয়া গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে মেয়ের মামা উত্তর করিল, মধুগল্য গোত্র। পুরোহিত থমকিয়া গেলেন। প্রতিবেশী হারাধন ভট্টাচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "মধুগল্য গোত্র! রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের শাণ্ডিল্য কাশ্যপ ভরদ্বাজ সাবর্ণ বাৎস্য এই পাঁচ ছাড়া তো গোত্র নাই?"

মেয়ের মামা তাড়াতাড়ি নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, "ভুল হ'য়েছে, ভুল হ'য়েছে, শাণ্ডিল্য গোত্র।"

অমনি প্রশ্ন হইল—উপাধি কি? কোন্ গাঁই? সে প্রশ্নের উত্তর কেহ দিল না। উত্তরের আশায় সকলেই মেয়ের মামাকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু মামা কোথায়? তখন মামা মামা চীৎকারে গ্রামখানা শব্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মামা তখন গ্রাম পার হইয়া মাঠের অন্ধকারে আত্মগোপনপূর্ব্বক, দ্রুতগতিশীল চরণদ্বয়ের বেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামের লোকের সাগ্রহ আহ্বানধ্বনি তাঁহার কর্ণে পৌঁছিল না; পৌঁছিলেও তাহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করিলেন না, শুধু পেটের কাপড়টা একবার টিপিয়া টাকার পুঁটুলিটা যথাস্থানে আছে কি না তাহাই দেখিয়া লইলেন।

এদিকে মামাকে না পাইয়া সকলে মেয়ের মাকে চাপিয়া ধরিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ, মামারূপী গোবর্দ্ধনবাবু আসলে গোবর্দ্ধনশর্ম্মা নহে, উহার প্রকৃত নাম গোবরা বৈরিগী; নাম গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। তাহার

কোকিলকণ্ঠে এবং তিলক ফোঁটার আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া এক ব্রাহ্মণ-বিধবা দেড় বৎসরের মেয়ে লইয়া কুল ত্যাগ করে। তার পর তাহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে হেয়াতপুরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকে। সেখানে ব্রাহ্মণ-পরিচয়েই বসবাস করিলেও ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করে নাই। তার পর মেয়েটী বড় হইলে তাহাকে কোন ব্রাহ্মণের হাতে দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়া গোবর্দ্ধন বিধবাকে প্ররোচিত করে। কিন্তু হেয়াতপুরে থাকিয়া তাহাদের এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক বাধা উপস্থিত হয়। অগত্যা গ্রাম ছাড়িয়া গোপনে এই স্থানে বিবাহ দিতে আসিয়াছে। এখন সেই পোড়ার মুখ নগদ টাকাগুলা হাত করিয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িল, তাহার ঠিকানা নাই। সে যে আর তাঁহাকে সহজে সাক্ষাৎ দিবে, এমন তো বোধ হয় না।

এইরূপ পরিচয় দিয়া মেয়ের মা গোবরা বৈরাগীর উদ্দেশে যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কোন ব্রাহ্মণ-রমণীর উপযুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে অনেকেরই সংশয় উপস্থিত হইল।

কেহ কেহ পরামর্শ দিল, মাগীকে পুলিসে দাও। কিন্তু মূল আসামী যখন টাকা-কড়ি লইয়া পলাইয়াছে, তখন মেয়ে-মানুষটাকে পুলিসে দিয়া কোন ফল নাই; তাহাতে শুধু একটা কেলেঙ্কারী হইবে মাত্র। সুতরাং মেয়ের সঙ্গে মাগীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হরিচরণ কিন্তু সহজে ছাড়িল না। সে অনুনয় বিনয় করিয়া সকলকে বলিতে লাগিল, মায়ের চরিত্র দূষিত হইলেও মেয়ে তো বামুনের মেয়ে বটে, সুতরাং তাহাকে গ্রহণ করা হউক। কিন্তু হরিচরণের এই অসঙ্গত প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিল না, পর দিনই মা ও মেয়ে উভয়কেই দূর করিয়া দিল। মেয়ের মা কিন্তু এক কথায় বিদায় হইল না; কাঁদা-কাটা করিয়া বলিল, তাহার হাতে

একটীও পয়সা নাই, নিঃসম্বল অবস্থায় দশ বারো ক্রোশ পথ কিরূপে যাইবে। সকলের নিষেধ ও উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া হরিচরণ তাহাকে পাথেয়-স্বরূপ পাঁচটি টাকা প্রদান করিল। টাকা পাইয়া মেয়ের মা হরিচরণের মত গুণবান্ জামাতার হস্তে কন্যাদান করিতে পারিল না বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। হরিচরণ তাহা-দিগকে বিদায় দিয়া আবার শূন্য-গৃহে শূন্য-হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

বিবাহ হইল না, লাভের মধ্যে পৈতৃক জমি কয় বিঘা গেল। তবে হরিচরণের ক্ষতি হইলেও ভৈরব চক্রবর্ত্তী যে ইহাতে লাভবান্ হইলেন এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ রহিল না। আধামূলে জমি কয় বিঘা হস্তগত করা ছাড়া তিনি যে অন্ততঃ নগদ টাকাও এক শত হাত করিয়াছেন, ইহা সকলেই অনুমান করিয়া লইল। তবে মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের রোষ-ভাজন হইতে কেহই সাহস করিল না।

ইহার পর হরিচরণ বিবাহের জন্য আর কখন উৎসুক হয় নাই। কেহ বিবাহের কথা তুলিলে গম্ভীরভাবে উত্তর করিত, "আমার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে।"

বিবাহটা স্বীকার করিয়া লইলেও নির্জ্জন গৃহটা যখন শূন্য-হৃদয়ে বিরাট্ উদাসভাব জাগাইয়া দিতে লাগিল, তখন হরিচরণ একজন সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল, এবং অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা পুরাতন বেহালা কিনিয়া সঙ্গীর অভাব পূর্ণ করিয়া লইল। কিন্তু এই নূতন সঙ্গীটার সহিত আলাপের চেষ্টা করিয়া যখন দেখিল, এই মূক সঙ্গীটার সঙ্গে আলাপ করিতে হইলে যে কৌশলের আবশ্যক, সে কৌশল তাহার সম্পূর্ণ অনায়ত্ত, তখন তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য হরিচরণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, এবং সে উদ্বেগ নিবারণার্থ অবশেষে বাবাজীদের আখড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিল।

মাস দুই যাতায়াতের পর কোন ক্রমে সা রে গা মা আরম্ভ করিয়া লইয়া শিক্ষা শেষ করিল, এবং ঘরে বসিয়া বেহালার কাণ টিপিয়া তারের উপর ছড়ি ঘষিতে ঘষিতে গাহিতে থাকিল—

"আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল,
সকলে ফুরায়ে যায় মা।"

গানের সঙ্গে সুর বা তালের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও নিজের ভাঙ্গা গলার বেসুরা গানের মধ্যে নৈরাশ্য-দগ্ধ দুঃখময় প্রাণের যে একটা করুণ সুর উত্থিত হইত, তাহাতেই হৃদয়ের সমস্ত তারগুলা প্রতিধ্বনিত হইয়া গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যেও তাহাকে যেন একটু সান্ত্বনার আভাস দিতে থাকিত। সুতরাং অন্য সুরের অপেক্ষা না রাখিয়াই সে আত্ম-বিস্মৃতভাবে গাহিতে গাহিতে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া দিত।

বিবাহের উদ্যোগের পর হইতে জ্ঞাতি খুল্লতাত ভৈরব চক্রবর্ত্তীর আচরণেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, হরিচরণের কেমন খেয়াল হইল, সে প্রায় প্রতিকথার সঙ্গেই 'খুড়ো' কথাটা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই হরিচরণ 'হরিখুড়ো' আখ্যা প্রাপ্ত হইল। গ্রামের বালক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে তাহাকে হরি-খুড়ো বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু এই খুড়ো কথাটার ভিতর হরিচরণের কতটা মর্ম্মবেদনা নিহিত ছিল, তাহা অনেকেই জানিত না।

তা' হরি-খুড়ো যে কেবল বেহালা বাজাইয়া আর গান গাহিয়াই দিন কাটাইত তাহা নহে, যে দুই চারি ঘর পৈতৃক যজমান ছিল, তাহাদের যাজনা কার্য্য করিত, গ্রামের এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়া সকলের তত্ত্ব লইত, এবং কাহারও কোন কাজ আট্‌কাইলে, পারুক্ বা না পারুক্, কাজটা সম্পন্ন করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইত। ইহাতে সে কাজের ভাল মন্দ বা ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিত না। এজন্য তাহাকে মধ্যে

মধ্যে বিপন্ন হইতেও হইত। একবার এক চণ্ডাল-রমণীর দাহ হয় নাই দেখিয়া সে তাহাকে দাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং চণ্ডাল-রমণীর শবস্পর্শ জন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। আর একবার জনৈক পতিত ব্যক্তির অনুরোধে তাহার ঘরে লক্ষ্মীপূজা করিয়া সমাজের নিকট নাকে কাণে খৎ দিয়াছিল। এমন শাস্তি দুই একবার নয়, অনেক বার ভোগ করিতে হইলেও শাসনের বিভীষিকা হরিখুড়োকে কোন দিন সংযত করিয়া রাখিতে পারিত না; কাজ পাইলেই তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়াই তাহা সম্পন্ন করিতে ছুটিয়া যাইত।

যখন কোন কাজ না পাইত, তখন হয় তো একদিন সকালে উঠিয়াই মিনির শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত হইত, এবং সেই সতেরো আঠারো বছরের ঘোমটা-ঢাকা বৌটাকে মিনি সম্বোধনে লজ্জিত করিয়া, তাহার হাতের রান্না খাইয়া আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে ফিরিয়া আসিত। মিনি আর এক বেলা থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলে হরি-খুড়ো অসম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিত, "উঁহু, আমার কি ঘর ছেড়ে থাক্‌বার যো আছে?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমার সাক্ষী না পাইয়া ব্রজনাথ যখন একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হরি-খুড়ো উপযাচক হইয়া তাহাকে বলিল, "ভয় কি ব্রজবাবু, আমি সাক্ষী দেব!"

ব্রজনাথ হরি-খুড়োকে চিনিত; সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিতে

না পারিলেও হাসিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণে স্বীকৃত হইল। সাক্ষী যে একেবারেই পাওয়া যায় নাই তাহা নহে, ব্রজনাথের তিন চারিজন প্রজা সাক্ষ্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইতর লোক—কেহ বাগ্দী, কেহ চাঁড়াল; তাহাদের সাক্ষ্য হাকিমের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কি না সে সম্বন্ধে ব্রজনাথের সন্দেহ ছিল। তবে হরি-খুড়ো ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহার উপর মাথাপাগলা লোক; সে যদি কোনরূপে নায়েবের অত্যাচারটা প্রমাণ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে, অনেকটা সুফলের আশা করা যাইতেও পারে। তবে এখন সম্মত হইলেও কার্য্যকালে হরিখুড়ো পশ্চাৎপদ হইবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং হরিখুড়োর অঙ্গীকারের উপর ব্রজনাথ সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

কিন্তু ব্রজনাথ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, কার্য্যকালে হরিখুড়ো পিছাইল না, পিছাইল গিরিশ সরকার নিজে। সুচতুর নায়েব মহাশয় যখন তাহাকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, রাগের মাথায় গ্রহবৈগুণ্যে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই। এখন উহা লইয়া মামলা চালাইলে লাভের মধ্যে উভয় পক্ষই হয়রান্ হইবে। আর মামলায় হারিলে নায়েব মহাশয়ের বড় জোর বিশ পঁচিশ টাকা জরিমানা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সরকারের লাভ, গিরিশ তাহার এক পয়সাও পাইবে না। সুতরাং ইহার মত ঝক্‌মারির কাজ আর কি আছে? ভদ্রলোক মাত্রেরই এমন ঝক্‌মারির কার্য্য হইতে নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা সত্ত্বেও গিরিশ যদি জেদের বশবর্ত্তী হইয়া মামলা চালায়, তবে নায়েব মহাশয়ও সহজে ছাড়িবেন না; শুধু নিম্ন-আদালতেই উহার জের মিটিবে না, আপীলের পর আপীল চলিবে। তা ছাড়া গিরিশের নামে যে আরও দুই এক নম্বর মোকদ্দমা রুজু হইতে পারে এমন সম্ভাবনাও নায়েব মহাশয় ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন।

গিরিশ কতকটা নায়েবের খাতিরে, কতকটা ভয়ে মোকদ্দমা হইতে নিবৃত্ত হইবার অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন। ব্রজনাথ কিন্তু সে অঙ্গীকারের কথা জানিল না; গিরিশও লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। তার পর মোকদ্দমার দিন খুব সকালে আসিয়া ব্রজনাথ যখন গিরিশকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল, তখন গিরিশ ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিল; মেয়ে কমলা বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা বাড়ীতে নাই।"

ব্রজনাথ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে নাই? কোথায় গিয়েছেন?"

কমলা উত্তর দিল, "জানি না।"

উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসিতে তাহার ঠোঁট দুইটা যেন ফুলিয়া উঠিল। ব্রজনাথ কিন্তু সে হাসির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে বলিল, "সে কি, কোথায় গেলেন তিনি? আজ যে মোকদ্দমার দিন। এর পর তিন ক্রোশ পথ গিয়ে ১০ টায় হাজির হ'তে হবে।"

কমলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই তো, আজ মোকদ্দমার দিন ব'লে তাঁর মনে নাই কি?"

ঘাড় নাড়িয়া কমলা উত্তর করিল, "হুঁ, মনে আছে।"

ব্রজ। তবে তিনি এমন সময় কোথায় গেলেন?

কম। কোথাও যান্ নি।

আশান্বিতভাবে ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলে, "তা হ'লে তিনি বাড়ীতেই আছেন বল।"

যেন সচকিতভাবে কমলা বলিল, "না না, বাড়ীতে আছেন কে বল্‌লে?"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "কে আর বল্‌বে? এই তো তুমিই বল্‌লে।"

ভীতভাবে কমলা বলিল, "বেশ তো তুমি! আমি আবার কখন বল্‌লাম যে, বাবা বাড়ীতে আছেন? বাবা তো সে কথা বল্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছেন।"

বলিয়া সে পশ্চাতে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার কথায় ও ভাব-ভঙ্গীতে সন্দিগ্ধ হইয়া ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তিনি বারণ করেছেন বলতে পার?"

"হুঁ।"

"কৈ, বল দেখি।"

"বাবা আর মামলা কর্‌বেন না।"

"মামলা কর্‌বেন না! কে বল্‌লে?"

"বাবা।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, "তোমার কাছে ব'লেছেন বুঝি?"

ঘাড় মুখ নাড়িয়া কমলা বলিল, "হুঁ, আমার কাছে বল্‌বেন কেন? মার কাছে বল্‌ছিলেন, আমি সব শুনেছি।"

ব্রজনাথ বর্দ্ধিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মামলা চালাবেন না?"

কমলা বলিল, "নায়েব মশায় বারণ ক'রে দিয়েছে।"

গভীর বিস্ময়ে ও ক্ষোভে স্তম্ভিত হইয়া ব্রজনাথ নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কথাটা কি সত্য! হইতে পারে, নায়েব মহাশয় গিরিশকে ডাকাইয়া ভীতি ও প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া মোকদ্দমা হইতে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই স্বার্থপরতাপূর্ণ অনুরোধে সরকার মশায় নিবৃত্ত হইবেন কি? অপমান ও অত্যাচারের জ্বালা বিস্মৃত হইয়া আততায়ীকে এত সহজে ক্ষমা করিতে পারিবেন কি? বিশ্বাস হয়

না, কিন্তু কমলার কথাতেও অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। তবু সাক্ষাতে তাঁহার অভিপ্রায়টা জানিতে পারিলেই ভাল হইত। সাক্ষাতের আশায় ব্রজনাথ আরও কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর নিতান্ত হতাশচিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ না তোর মোকদ্দমার দিন ছিল বেজো?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রজনাথ উত্তর করিল, "মামলা মোকদ্দমা করা ভাল কাজ কি নতুন-মা?"

সহাস্যে আমোদিনী বলিলেন, "মন্দ বুঝেই হাত ছেড়ে দিলি বুঝি?"

ব্রজনাথ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিল। আমোদিনী তখন ব্যাপার জানিতে চাহিলে ব্রজনাথ গিরিশ সরকারের অভিপ্রায় খুলিয়া বলিল। শুনিয়া আমোদিনী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি তো আগেই সে কথা ব'লেছিলাম।"

লজ্জিতভাবে ব্রজনাথ বলিল, "আমি তখন বুঝ্‌তে পারি নাই নতুন-মা, হতভাগা লোকগুলো প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে এত ভালবাসে, আর সে মারের যাতনা এত সহজে ভুলে যেতে পারে।"

আমোদিনী বলিলেন, "লোকগুলোর দোষ নাই বেজো, তাদের ক্ষমতা কতটুকু যে, এ আঘাতের প্রতিঘাত দিয়ে তারা আপনাদের সবলতার পরিচয় দিবে। তা' দিতে গেলে একটা আঘাতের পরিবর্ত্তে দশটা আঘাত এসে তা'দের চূর্ণ ক'রে দেবে যে।"

ব্রজনাথ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমোদিনী বলিলেন, "যাক্, যারা নিজে প'ড়ে মার খায়, তা'দের তরে তোর এত মাথা ব্যথায় কাজ নাই। এখন আমার একটা কথা শুন্‌বি?"

"কি কথা নতুন-মা?"

"একটী ভাল মেয়ে দেখেছি।"

"মেয়ে একটী কেন, অনেক তো দেখেছ, নতুন-মা!"

"কিন্তু এটী পরমা-সুন্দরী। দেবে থোবেও ভাল।"

ব্রজনাথ একটু হাসিল। আমোদিনী বলিলেন, "তুই একবার দেখে আসবি?"

সময় পাই তো যাব" বলিয়া ব্রজনাথ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"রাজু!"

"কেন মা?"

"ওখানে একবার গেলি না কেন?"

"গিয়ে হ'বে কি?"

"আমার শ্রাদ্ধ আট্‌কে রয়েছে যে।"

মুখখানাকে ভারী করিয়া বিরাজ বলিল, "তোমার শ্রাদ্ধ আট্‌কে থাকে, তুমি নিজে গেলেই তো পার।"

ঈষৎ রাগতভাবে কল্যাণী বলিলেন, "আমার যাবার উপায় থাক্‌লে তোর এত খোসামোদ কত্তাম না।"

ভারী-মুখে বিরাজ বলিল, "আমি কাউকে খোসামোদ ক'ত্তে বলি না। তবে হাত পাত্‌তে আমি কারো দোরে যেতে পার্‌বো না।"

কল্যানী বলিলেন, "জিনিস রেখে টাকা আন্‌বি, তার আবার হাত পাতা কি?"

বিরা। জিনিস রেখেই যখন টাকা আন্‌বে, তখন ওদের ওখান ছাড়া আর কি জায়গা নাই?

কল্যা। জায়গা অনেক আছে, কিন্তু টাকায় এক পয়সা সুদ দিতে পার্‌বি?

বিরা। সুদই যখন দিতে পার্‌বে না, তখন ধার ক'রে খেতে যাওয়া কেন?

কল্যা। না খেলে চ'ল্‌বে না, কাজেই খেতে হয়। উপোস্ দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বি?

বিরা। আমি একা উপোস্ দিলেই যদি ধার করা বন্ধ হ'তো, তা' হ'লে থাক্‌তে পারি কি না দেখিয়ে দিতাম।

কল্যা। সেটা দেখাবার উপায় যখন নাই, তখন কাজেই খেতেও হ'বে, ধার ক'ত্তেও হ'বে।

বিরা। ধার ক'ত্তে হয় নিজেরা যাও, আমার দ্বারা ওসব হ'বে না।

এই স্পষ্ট জবাবে কল্যাণী রাগে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিরাজ আপন মনে ছোট-ভাই ননীগোপালের মুখে ভাত তুলিয়া দিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কল্যাণী কন্তার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাবি না?"

গম্ভীরভাবে বিরাজ উত্তর দিল, "না।"

"না গেলে চ'ল্‌বে?"

"খুব চ'ল্‌বে। চলাচলি তো এই দুটোকে নিয়ে। তা' মণে তো খেয়ে ইস্কুলে চলে গিয়েছে, এরও খাওয়া হ'লো।"

"এবেলা হ'লো, কিন্তু ওবেলা?"

"কুন্‌কেখানেক চাল প'ড়ে আছে, তাই হ'লেই ওবেলা ঢের হ'বে। তারপর মুখুজ্যেদের ছোট-বৌ তো কাঁথা সেলাইএর দামটা দেবে বলেছে।"

মুখ মচ্‌কাইয়া কল্যাণী বলিলেন, "সে তো অনেক—চার গণ্ডা পয়সা।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিরাজ বলিল, "যার এক পয়সার সংস্থান নাই, তার পক্ষে চার গণ্ডা পয়সা চারটে মোহর।"

কল্যাণী বলিলেন, "মোহরই হোক্, গিনিই হোক্, সে তো কাল পাবি। আজ কি খেয়ে থাক্‌বি ?"

রোষ-গম্ভীর-কণ্ঠে বিরাজ বলিল, "ছাই খেয়ে! বুড়ো মাগী হু'টো, একদিন না খেলে মরে যাব নাকি ?"

দুঃখ-বিজড়িত-স্বরে কল্যাণী বলিলেন, "মরণটা এত সহজ হ'লে ভাব্‌না ছিল কি! কিন্তু কাল একাদশী, সেটা মনে আছে ?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া বিরাজ বলিল, "অনাথের দৈব সখা। পোড়া পাঁজিকাররা যদি মাসে আরো দু'চারটে একাদশীর ব্যবস্থা কত্তো।"

কল্যাণীরও বড় দুঃখের উপর হাসি আসিল। কিন্তু তাহা চাপিয়া বিষাদ-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "তারা তো জানে না যে, ফল্‌না ঘোষের মেয়ের নিত্যিই একাদশীর দরকার!"

তাঁহার বুকের পাঁজরাগুলাকে কাঁপাইয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বড় জোরেই বাহির হইল। মাতার সে বেদনাভরা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ মেয়ের কাণে গেল। মেয়ে কিন্তু তাহাতে একটুও দুঃখভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সত্যি মা, একাদশীর নাম শুন্‌লে আমার কিন্তু খুব আহ্লাদ হয়।"

বাষ্প-জড়িত-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "তা' তো হবেই। কি পোড়া-কপাল নিয়েই সংসারে এসেছিলি রাজি ? এসেছিলি তো তার সঙ্গে এত-খানি অভিমান নিয়ে এলি কেন ?"

কল্যাণীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। নন্দীর তখন খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। বিরাজ তাহাকে উঠাইয়া মাতার দিকে ফিরিয়া বলিল,

"আমার পোড়াকপালের তরে বিধাতাকে গাল দিয়ে তুমি ততক্ষণ দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল, আমি ছেলেটাকে আঁচিয়ে ধুইয়ে নিয়ে আসি।"

বলিয়া সে ননীর হাত ধরিয়া পুকুর-ঘাটে চলিয়া গেল। কল্যাণী জলভরা চোখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ছোট ভাইকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া দিয়া বিরাজ উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিল। তার পর দাবার উপর একখানা কাঁথা পাড়িয়া লইয়া সেলাই করিতে বসিল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আবার কাঁথা নিয়ে বস্‌লি যে?"

সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়াই বিরাজ উত্তর করিল, "কি কর্‌বো?"

"যাবি না?"

"না।"

গভীর নৈরাশ্যে কল্যাণীর দুঃখ-মলিন মুখখানা আরও অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি এবার একটু নতভাবে বলিলেন, "দেখ্‌ রাজি, কাল যদি একাদশী না হ'তো, কোন্‌ বেজম্মার মেয়ে তোকে যাবার জন্যে এত সাধ্যি-সাধনা ক'ত্তো।"

বিরাজ নিরুত্তরে আপন মনে কাঁথার উপর ছুঁচ চালাইতে লাগিল। তাহার এই উদাসভাব দর্শনে রোষ-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "আচ্ছা রাজু, তোর প্রাণে কি একটু দয়ামায়াও নাই?"

বিরাজ উত্তর করিল, "দয়ামায়ার অভাবটা কিসে দেখ্‌ছো?"

কল্যাণী বলিলেন, "দয়ামায়া থাক্‌লে কক্ষণো তুই এমন চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌তিস্‌ না। আচ্ছা, তোর সোমত্ত বয়েস, তুই যেন দু'দিন উপোস্‌ দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বি, কিন্তু আমি বুড়ো-মাগী, রোগে শোকে আমার দেহ জর জর, আমি কি এমন ক'রে উপোস্‌ দিতে পারি?"

বিরাজের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য যেন সিন্দুরমণ্ডিত হইয়া উঠিল, কিন্তু

তৎক্ষণাৎ তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুব পার্‌বে মা। এই তো সেদিন হাঁড়িতে একজনের ভাত ছিল, তুমি বল্‌লে, তুই খা রাজু, আমি বুড়ো-মাগী, উপোস্‌ দিয়ে খুব থাক্‌তে পার্‌বো।"

হাত দুইটাকে জড় করিয়া অধীরভাবে কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "ব'লেছিলাম রাজি, দু'শোবার আমি অন্যায় ক'রেছি। তখন যদি জান্‌তাম, সেই কথাটার তরে তুই আজ আমাকে এমন কঠিন শাস্তি দিবি—"

মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু দুই চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিরাজেরও চোখের পাতাগুলা ভারী হইয়া আসিল; দৃষ্টিটা এমন ঝাপ্‌সা হইয়া গেল যে, হাতের সূচ আর চলিল না। সূচ ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া সে আঁচলে মায়ের চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আচ্ছা মা, যত বয়স হ'চ্চে, তত কি তুমি পাগল হ'চ্চো?"

সান্ত্বনায় চোখের জল আরও বেগে হু হু করিয়া ছুটিল; কাঁদিতে কাঁদিতে জড়িত-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "একে তো যম আমাকে পাগল ক'রেছে রাজি, তার ওপর তোদের পেটে ধ'রেছি, তোরাও যদি এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাকে পাগল করিস্‌, তা' হ'লে আর আমার বেঁচে সুখ কি বল্‌ তো?"

তাঁহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বিরাজ গাঢ়-স্বরে বলিল, "আমরা তোমাকে কিসে পাগল কচ্ছি মা, তুমিই তো আমাদের তরে ভেবে ভেবে পাগল হ'তে ব'সেছ।"

বিরাজও আর থাকিতে পারিল না; তাহার চোখের কোল বহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া কল্যাণীর হাতের উপর পড়িল। কল্যাণী মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিত হইলেন, এবং আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিবার

অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে অশ্রুকাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "সাধে কি ভাবি রাজি, একে তো এমনি পোড়াকপাল যে, দু'বেলা তোর পাতে দু'মুঠো মাছ ভাত দিতে পারি না। তার ওপর দশমীর দিনেও যদি তোর পেটে এক-সন্ধ্যে এক মুঠো দিতে না পারি, তবে আমার সে দুঃখ রাখ্‌বার ঠাঁই আছে কি!"

বিরাজ বলিল, "তুমি কি ক'র্‌বে মা, আমার যেমন কপাল!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তোরও কপাল, আমারও কপাল!"

বলিয়া তিনি চোখ দুইটা ভাল করিয়া মুছিয়া একটু সোজা হইয়া বসিলেন। বিরাজ আসিয়া কাঁথা খানা ভাঁজ করিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, "আচ্ছা মা, কি জিনিস দেবে দাও। কিন্তু অনেকটা বেলা হ'য়ে গেল, গিন্নী হয় তো এতক্ষণ আহ্নিকে বসেছে।"

"তা' বসুক্, তুই একটু ব'সে থেকে নিয়ে আস্‌বি। আমাদেরও তো সেই এক সন্ধ্যে খাওয়া, হ'লেই বা একটু বেলা।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং এক ছড়া রূপার নিমফল আনিয়া বিরাজের হাতে দিলেন। গহনাটা হাতে লইয়া বিরাজ বলিল, "ননীর নিমফলটা দিলে মা, ও যদি পর্‌বার তরে বায়না করে?"

কল্যাণী বলিলেন, "না না, বায়না কর্‌বে না। করে, তখন ভুলিয়ে রাখা যাবে।"

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছাড়া আর কিছু নাই?"

উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাসটা চাপিয়া কল্যাণী বলিলেন, "আর একটু রাংরত্তি বল্‌তে নাই।"

বিরা। কত টাকা চাইবো?

কল্যা। পাঁচ টাকা চাইবি, তারপর যা' দেয়।

বিরা। যা' দেয় কেন, গিন্নী তেমন নয়, পাঁচ টাকাই দেবে। কিন্তু মা!

কল্যা। কেন রাজু?

বিরা। এই পাঁচ টাকা ফুরিয়ে গেলে কি হ'বে?

কল্যা। ভগবান্ জানেন। এখন তিলেক বাঁচ্লে সহস্র প্রমাই।

বিরাজ নীরবে নিমফলটা হাতে লইয়া বাষ্পপূর্ণ-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আহা, কোমরে ঘা হওয়ায় সেদিন কত ভুলাইয়া ছেলেটার কোমর হইতে খুলিয়া লওয়া হইয়াছে! ননী কি খুলিতে দেয়? কালও পরিতে চাহিয়াছিল, ঘা দেখাইয়া থামাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু ঘা শুকাইলে যখন পরিতে চাহিবে, তখন—ভগবান্, মানুষকে এত দুঃখ দিয়া তোমার কোন্ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সাধন কর দয়াময়?

বিরাজের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ জল গড়াইয়া হাতের নিমফলের উপর পড়িতে লাগিল।

এমন সময় প্রতিবেশী গোপী ঘোষের পিসী বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিলেন—"বিরাজ, ও বিরাজ!"

বলিতে বলিতে তিনি একেবারে বিরাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার হাতের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, সে দিন মেজবৌ চাল একসের এনেছিল। তা এনেছে তো এনেছে, কে অত মনে ক'রে রাখে মা। আমার স্বভাব, কাউকে ধার ধোর দিলে মনেই থাকে না। বৌটা কিন্তু ধড়ীবাজ, তার মনে গাঁথা আছে। আজ চাল বাড়ন্ত হ'য়েছে, তা বৌমা বল্লে, দেখ না পিসী, মেজ খুড়ী যদি চাল সেরটা দিতে পারে।"

সপ্রতিভ ভাবে বিরাজ বলিল, "সে কি পিসীমা, সে চাল তো আমি দিয়ে এসেছি।"

পিসীমা বলিলেন, "দিয়ে এসেছ? কে জানে বাছা, তবে যে বৌমা বল্‌লেন—"

বাধা দিয়া বিরাজ বলিল, "বৌ কেন পিসীমা, আমি যে তোমার কাছেই দিয়ে এলাম, তুমি মেপে নিয়ে ঘরে তুল্‌লে।"

পিসীমা খুব আশ্চর্য্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার কাছে দিয়ে এসেছ? কৈ বাছা, আমার তো মনে পড়ে না।"

বিরাজ বলিল, "তা হ'লে তুমি ভুলে গিয়েছ।"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে পিসীমা বলিলেন, "না বাছা, ভুল্‌বার মেয়ে আমি নই। সাত বছরের কথা আমার মনে গাঁথা থাকে। কে জানে, কখন্ দিয়ে এসেছ।"

বিরাজ বলিল, "তুমি মনে ক'রে দেখ পিসীমা, তুমি নেয়ে এসে রান্না চাপাতে যাচ্ছিলে।"

ঘাড় দোলাইয়া পিসীমা বলিলেন, "তা হবেও বা, আমার কিন্তু বাছা কিচ্ছু মনে নাই। তা দিয়ে থাকিস্ দিয়েছিস্, না দিয়ে থাকিস্, মনে না থাকে, না হয় একসের চাল তোদের খেতে দিলাম। আপনা আপনি এমন তো দিতেও হয়। তোর হাতে ওটা কি?"

বিরাজ বলিল, "নিমফল।"

"কৈ দেখি" বলিয়া পিসিমা হাত বাড়াইয়া সেটা লইলেন, এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ননীর কোমরে ছিল না? নিয়ে যাচ্ছিস্ কোথায়?"

বিরাজ। তুলে রাখ্‌ছি।

পিসী। ছেলের কোমরে ছিল, খুলে তুলে রাখ্‌ছিস্ কেন?

এত কৈফিয়ৎ দেওয়া অনাবশ্যক বোধে বিরাজ চুপ করিয়া রহিল। পিসীমা সেটাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "চাঁদী নয়, খাদ রূপা।

গুপীর ছেলের তরেও এক ছড়া গড়াতে দিয়েছি, তবে সে এমন নয়, কল্‌কেতার আসল চাঁদীরূপার।"

বলিয়া তিনি গর্ব্ব-মিশ্রিত হাস্যের সহিত বিরাজের মুখের দিকে চাহিলেন। বিরাজ কিন্তু ইহাতে সন্তোষ বা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল না।

ঠিক এই সময়ে ননী কোথা হইতে সেখানে উপস্থিত হইল, এবং পিসীমার হাতে নিমফল দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাল।"

পিসীমা মৃদু-সহকারে বলিলেন, "হাঁ বাবা, তোমারি গয়না, আমি দেখ্‌ছি।"

ননী বলিল, "আমি পল্‌বো।"

তাহাকে ধমক দিয়া বিরাজ বলিল, "না না, এখন পরে না।"

সহানুভূতি-পূর্ণস্বরে পিসীমা বলিলেন, "আহা, পরুক্ না।"

বলিয়া তিনি ননীর দিকে হাতটা বাড়াইয়া দিলেন। বিরাজ তাঁহার হাত হইতে গহনাটা ছিনাইয়া লইল। ননী কাঁদিয়া বলিল, "আমি জামা পল্‌বো, আমি গন্‌না পল্‌বো।"

বিরাজের দিকে চাহিয়া পিসীমা বলিলেন, "আহা, দে না বাছা, পরুক্।"

বিরাজ কিন্তু দিল না। ননী কাঁদিয়া, তাহার কাপড় টানিয়া অনর্থ বাধাইতে লাগিল। পিসীমা তখন এই সামান্য একটা গহনার জন্য ছেলেটাকে কাঁদাইতে দেখিয়া তাহার মৃত পিতার উদ্দেশে আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে ব্যথিতচিত্তে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় তিনি উঠানের লঙ্কা গাছ হইতে বাছিয়া বাছিয়া গোটা কতক পাকা পাকা লঙ্কা লইয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে বিরাজ গহনা বাঁধা দিবার জন্য প্রস্থানোদ্যত হইল।

ননী কিন্তু ছাড়িল না, সে চীৎকারে বাড়ী মাথায় করিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কল্যাণী আসিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিলেন। চড় খাইয়া ননী দিদির পায়ের কাছে লুটোপুটি খাইতে লাগিল। কল্যাণী তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বিরাজকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিরাজ কিন্তু যাইতে পারিল না; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিমফলটা সজোরে মাটীর উপর আছড়াইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

এমন সময় "জ্যেঠাই-মা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ব্রজনাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথকে দেখিয়া বিরাজ যেন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি আসিয়া বসিতে আসন দিলেন। ব্রজনাথ আসনে বসিয়া রোরুদ্যমান বালকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাঁদছে, জ্যেঠাই-মা!"

কল্যাণী বলিলেন, "ওর কথা ছেড়ে দাও বাবা।"

বলিয়া তিনি ছেলেটাকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত বিরাজকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিলেও বিরাজ উঠিল না, নড়িল না, যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। তবে ননীকে সরাইয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল না, ব্রজনাথকে দেখিয়া সে ভয়েই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক, সে আপনা হইতেই চুপ করিয়া গেল।

ব্রজনাথ তখন বিরাজের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক ঘটী জল দিতে পার ?"

বিরাজ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু অনেকক্ষণেও বাহির হইল না দেখিয়া কল্যাণী ডাকিলেন, "কৈ গো, জল নিয়ে আয় না।"

কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে পড়িল, ঘরে এমন একটু গুড় বা একখানা বাতাসা নাই যাহা দিয়া কাহাকেও জল দেওয়া যাইতে পারে। সেই লজ্জাতেই শুধু জল লইয়া বিরাজ বাহির হইতে পারিতেছে না ইহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া তিনি বিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঘরে কি গুড়—"

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ব্রজনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "চমৎকার! তাই বুঝি রাজু জল আন্‌তে পার্‌ছে না? ওগো, আমার কিছু দরকার নাই, শুধু এক ঘটী জল। ঐ নপাড়া গিয়েছিলাম কি না, রোদে ফির্‌তে বড্ডই তেষ্টা লেগেছে।"

বিরাজ নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে জলের ঘটীটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া সরিয়া গেল। ব্রজনাথ ঘটীর সমস্ত জলটা গলায় ঢালিয়া দিয়া একটা আরামসূচক শব্দ করিল। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নপাড়ায় কেন গিয়েছিলে বেজো?"

ব্রজনাথ বলিল, "জমিদার বাবুর কাছে গিয়েছিলাম, দেখা কর্‌তে।"

কল্যাণী বলিলেন, "দেখা হ'লো?"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "আমার এমন কি সৌভাগ্য জ্যেঠাই-মা যে, একবার গিয়েই জমিদার বাবুর দেখা পাব। আচ্ছা জ্যেঠাই-মা, এই জমিদার বাবুগুলি কোন্ শ্রেণীর জীব বল্‌তে পার?"

ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "কেন বল্ দেখি?"

ব্রজনাথ বলিল, "যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছ্‌লাম, তখন বেলা সাড়ে

আটটার কম নয়। কিন্তু শুন্‌লাম, তখনও বাবুর ঘুম ভাঙ্গেনি; অথচ তিনি এতবড় একটা জমিদার, এই জমিদারীর কাজ কর্ম্ম সব দেখা শুনা করেন। চুলোয় যাক্, বাবুর ঘুম ভাঙ্গবার অপেক্ষায় দুটী ঘণ্টা বসে রইলাম। বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেল। শেষে চাকর এসে বল্‌লে, এ বেলা আর দেখা হবে না। আমি তো কৃতার্থ হ'য়ে গেলাম। বল্‌লাম, বাবুকে জানাও, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। কিন্তু সে কথা কেউ কানেই তুল্‌লে না। কাজেই ফিরে আস্‌তে হ'লো।"

কল্যাণী বলিলেন, "বড় লোকের বড় কথা, বাবা।"

মাথা নাড়িয়া ব্রজনাথ বলিলেন, "হোক্ না বড়লোক জ্যেঠাই-মা, ক'ল্‌কেতায় তো এর চাইতে অনেক বড়লোকের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁদের কিন্তু কেউ তো এমন অন্দর-মহলে বসে সাফ্ জবাব দেন্ নি—দেখা হ'বে না। যাঁর সময় খুব কম, তিনিও সাম্‌নে এসে অন্ততঃ নিজের ত্রুটী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন অভদ্র ব্যবহার বোধ হয় এই পাড়াগাঁয়ের জমিদারদের পক্ষেই সম্ভব। এঁরা একটা জমিদারী পেয়ে বোধ হয় মানুষগুলোকে মানুষই মনে করেন না।"

কল্যাণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রজনাথ বলিল, "গিয়েছিলাম কেন জান, ঐ যে চাঁড়াল-পাড়ায় বড় পুকুরটা—চমৎকার জল, বিস্তর লোক ঐ পুকুরের জল খায়। কিন্তু গাঁয়ের প্রায় অর্দ্ধেক লোক, ঐ পুকুর ছাড়া আর কোথাও মড়া পোড়াতে জায়গা পায় না। ধোপা বেটাও ঐ পুকুরে সারা গাঁয়ের কাপড় নিয়ে গিয়ে কাচে। তার ফলে হ'চ্চে কি জান, যতগুলো লোক ঐ পুকুরের জল খায়, তারা কয় মাসের মধ্যে একটা দিনও ম্যালেরিয়ার হাত ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না। গাঁয়ের অনেককেই একথা ব'লেছিলাম, কিন্তু তাঁরা বলেন, জমিদারের পুকুর, আমরা কি কর্‌বো। নায়েবকে জানালাম, তাঁরও ঐ উত্তর—চিরকাল চ'লে আস্‌ছে।

কাজেই জমিদারের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যে রকম কাজের লোক, তা'তে তাঁর দ্বারায় কতটুকু কাজ হ'বে তা' বুঝ্‌তেই পার্‌ছি।"

বলিয়া ব্রজনাথ হাসিয়া উঠিল। কল্যাণী বলিলেন, "তা' বাছা, তোমার এ বাজে কাজ। পুকুরের পাড়ে মড়া পোড়ায়, জলে তো নয়। তবে ঐ জল খেয়ে অসুখ কর্‌বে কেন?"

ব্রজনাথ বলিল, "পাড়ের ঐ সব ময়লা ধুয়ে এসে কি জলে পড়ে না? আর জলের সঙ্গে সেই সব ময়লা মানুষের পেটে যায় না?"

কল্যা। জল নারায়ণ; জলে কি কোন দোষ থাকে?

ব্রজ। জল যে নারায়ণ, এ কথা অনেকদিন আগে মুনি-ঋষিরাও ব'লে গেছেন জ্যেঠাই-মা; আর তাঁদের সে কথা ব'ল্‌বার উদ্দেশ্য—জলকে নারায়ণের ন্যায় পবিত্রভাবে রাখা। কিন্তু আমরা এখন সেই নারায়ণকে যতটা পারি নোংরা ক'রে ঠিক বিষের মত উদরস্থ করি। আর বারো মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগি।

কল্যা। এটা তোমার কথাই নয় বেজো, অসুখ-বিসুখ, মরণ-বাঁচন সব কপালে করে। জল খেলেই কি অসুখ হয়?

ব্রজ। কপালটা কোন আশ্‌মানের জিনিস নয় জ্যেঠাই-মা, আমরা যে কাজ করি, তারই ফল কপাল বা অদৃষ্টরূপে আমাদের ভোগ ক'ত্তে হয়। পাপ ক'র্‌লে দুঃখ, আর পুণ্য ক'র্‌লে সুখ হয় এটা মান তো?

কল্যা। তা' আর মানি না?

ব্রজ। তবেই দেখ, মন্দ কাজ ক'র্‌লে তার মন্দ ফল পেতেই হবে।

কল্যা। তা পুকুরের পাড়ে মড়া পোড়ান বন্ধ কর্‌লেই কি জ্বর-জাড়ি আর হবে না?

ব্রজ। শুধু মড়া পোড়ান নয়, মড়া পোড়ান, কাপড় কাচা, সব বন্ধ ক'ত্তে হবে।

কল্যা। কাপড় সব কাচবে কোথা?

ব্রজ। গাঁয়ে কি আর পুকুর নাই? যে পুকুরের জল কেউ খায় না, সেই পুকুরে স্বচ্ছন্দে কাপড় কাচা চল্‌তে পারে।

কল্যা। এত কি আর কেউ ক'ত্তে চাইবে?

ব্রজ। সহজে না করে, জোর ক'রে করাতে হবে। দেখ্‌ছি, গাঁয়ের লোক বা জমিদারের দ্বারা কিছুই হবে না। এবার আমাকে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত ক'ত্তে হবে।

শঙ্কিতভাবে কল্যাণী বলিলেন, "ওমা, মেজেষ্টরের কাছে যাবি?"

ব্রজনাথ বলিল, "কাজেই। দেখ্‌ছি, লালমুখের হুকুম না পেলে এ দেশের লোকে কিছুতেই সোজা-পথে চল্‌তে চায় না।"

ভীতিপূর্ণ স্বরে কল্যাণী বলিলেন, "কে জানে বাছা, কি আবার একটা হাঙ্গাম বাধাবি।"

ব্রজনাথ বলিল, "হাঙ্গামা কিছুই নাই জ্যেঠাই-মা, শুধু গোটা কতক সই নিয়ে একখানা দরখাস্ত পেশ করা। ভাল কথা, হাটপুকুরে না তোমাদের অংশ আছে?"

কল্যাণী বলিলেন, "হাঁ, আমাদের চার আনা অংশ।"

ব্রজনাথ বলিল, "বেশ, ঐ চার আনা অংশ তোমরা বিক্রী কর্‌বে? ঐ পুকুরের জলটা ভাল, ওটারও আমি সংস্কার করাবো। তোমাদের চার আনা অংশ পেলে আমার জোর দাঁড়াতে পারে। ন্যায্য দাম যা, তা আমি দেব। বল যদি আজই কতক টাকা দিয়ে যেতে পারি।"

একটু ভাবিয়া কল্যাণী বলিলেন, "বেশ তো, পুকুরে ভাগই আছে, আয় তো কিছুই দেখ্‌তে পাই না। মাছ যা হয় পাঁচ জনে ধ'রে খায়। তা তুমি যদি নাও—"

বিরাজ একটু উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "না না, পুকুর বেচে না।"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, "বিক্রী কত্তে লজ্জা হয়, আমাকে না হয় দান কত্তে পার।"

রোষতীব্র-কণ্ঠে বিরাজ বলিল, "গরীব দান নেয়, দিতে পারে না, এটা জেনেও উপহাস ক'ত্তে আসা ঠিক হয় নি।"

ম্লানমুখে ব্রজনাথ বলিল, "আমি সত্যিই তোমাদের উপহাস ক'ত্তে আসি নাই রাজু, পুকুরটা অপরিষ্কার হ'য়ে আছে—"

বিরাজ বলিয়া উঠিল, "মণে যদি বাঁচে, বড় হ'য়ে পরিষ্কার করাবে।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, "ঈশ্বর করুন, তাই হোক্ রাজু। কিন্তু তুমি রাগ কর্‌বে জানলে আমি কক্ষণো একথা তুল্‌তাম না।"

ব্রজনাথ উঠিয়া কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। কল্যাণী বিরাজকে সম্বোধন করিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিলেন, "তুই কি রকম মেয়ে রাজু?"

গর্জ্জন করিয়া বিরাজ বলিল, "যেমনি মেয়ে হই, পেটের জ্বালা আমার এত বেশী নয় মা, যার কাছে অপমানের জ্বালাটা কম হবে।"

বলিয়া সে মাতার দিকে একটা তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক নিমফলটা কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তেঁতুল-গাছের ঘন পাতাগুলা মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রকে আপনাদের বুকের উপর লইয়া গাছের নীচে যেখানে আরামপ্রদ ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেইখানে গাছের একটা মোটা শিকড়ের উপর বসিয়া, উভয় হস্ত

হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা বল্, মা গো।"

"মা গো।"

"তারা।"

"তালা।"

"ও শঙ্করি।"

"ও ছংকলি।"

"মা গো তারা ও শঙ্করি।"

"মা গো ছংকলি।"

হরিচরণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "দূর বোকা, মা গো ছংকলি কি, বল্ মা গো তারা ও শঙ্করী।"

ঘাড় দোলাইয়া নিতাই বলিল, "তালা মা গো—"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "না; তোর দ্বারা গান হবে না।"

নিতাই নিজেও স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে আর গান শিখিতে চাহিল না; বলিল, "আমি পোঁ পোঁ ক'রবো।"

বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতের উপর ডান হাতটা ঘষিতে লাগিল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বেহালা বাজাবি?"

মাথা নাড়িয়া নিতাই বলিল, "হুঁ।"

হরিচরণ বলিল, "না না, এমন সময় বেহালা বাজায় না।"

নিতাই কিন্তু সময় অসময়ের পার্থক্য বুঝিত না; সুতরাং সে পা ঠুকিয়া মাথা নাড়িয়া আবদারের সুরে বলিল, "উঁ, পোঁ পোঁ বাজাব।"

তাহার আন্দোলিত ক্ষুদ্র মস্তকের দিকে চাহিয়া সহাস্যে হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা, বাজাবি চল্।"

বলিয়া সে নিতাইকে কোলে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

দেওয়ালের গায়ে বেহালাটা ঝুলিতেছিল। সে দিকে নজর পড়িতেই নিতাই হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল; এবং হরিচরণ বেহালাটা পাড়িয়া দিলে তাহা লইয়া বাজাইতে বসিল।

হরিচরণ ইদানীং বড় একটা বেহালা বাজাইত না, সুতরাং সেটা অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। কেবল নিতাই আসিলেই তাহার একটু আদর হইত। নিতাই আপনার ক্ষুদ্র মুখের ফুৎকার প্রদানে তাহার ধূলিরাশি অপসারিত করিত, তাহার গায়ে হাত বুলাইত, এবং স্বীয় ক্ষুদ্র স্কন্ধে স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া মাটীর উপর ফেলিয়া দুই হাতে তাহার তারগুলার উপর ছড়ি টানিতে থাকিত। তখন বেহালার কোঁ কোঁ শব্দের সহিত নিতায়ের কলহাস্য মিলিত হইয়া যে একটা মধুর সুরতরঙ্গের সৃষ্টি করিত, তাহাতে শুধু হরিচরণের নিঃসঙ্গ জীবনটা ক্ষণেকের জন্য একটা অব্যক্ত আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিত না, নির্জ্জীব বেহালাটাও যেন ওস্তাদের নিপুণ হস্তের স্পর্শ অপেক্ষা এই কাঁচা হাতের প্রতি টানে আপনার বেহালা-জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়া, ধাতব-তন্ত্রী কয়টার ভিতর দিয়া প্রাণের পরিপূর্ণ আনন্দ-প্রকাশের চেষ্টা করিতে থাকিত। তাহার এই চেষ্টার ফলে দুই একটা তার ছিঁড়িয়া যাইত; হরিচরণ যত্ন করিয়া ছেঁড়া তার জুড়িয়া দিত।

এমনি করিয়া তার জুড়িতে জুড়িতে শেষে যখন সঞ্চিত তার ফুরাইয়া আসিল এবং নূতন তার কিনিয়া আনিবার সুযোগ ও আগ্রহ হরিচরণের রহিল না, তখন অবশিষ্ট দুইটা তারের উপরেই ছড়ি টানিয়া নিতাই আপনার সঙ্গীত-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া লইত, কখনও বা শুধু কাঠের উপরেই ছড়ি ঘষিয়া মুখে কোঁ কোঁ গোঁ গোঁ উচ্চারণ করিতে করিতে

সঙ্গীত-রস উপভোগ করিত। আর হরিচরণ মুগ্ধ-নেত্রে শিশুর উৎসাহ-প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শূন্য মনের ভিতর যে একটা পূর্ণতার আস্বাদ অনুভব করিত, তাহাতে এই সাত টাকা দামের বেহালাটা নষ্ট হওয়ার জন্য সেখানে একটুও আক্ষেপের উদয় হইত না। বরং সে নিজেও উৎসাহের সহিত নিতাইকে সা রে গা মা শিখাইতে চেষ্টা করিত।

বেহালার কাঠের উপর ছড়ি টানিতে টানিতে সুরের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নিতাই মুখে উচ্চারণ করিতে লাগিল—পোঁ পাঁ। হরিচরণ বলিল, "পোঁ পাঁ কি রে? বল্ সা রে গা মা।"

নিতাই বলিল, "মা লে গা মা।"

মাথা নাড়িয়া হরিচরণ বলিল, "উঁহুঁ, মা কি, সা বল্।"

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা।"

"আবার মা? বল্ সা।"

"মা।"

"দূর বোকা, তোর কিছু হ'বে না।"

বলিয়া হরিচরণ যেন বিরক্তির সহিত মস্তক সঞ্চালন করিল। নিতাইও স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিল, "তোল কিছু হ'বে না।"

বলিয়া সে আপন মনে বাজাইতে লাগিল পোঁ পা। হরিচরণ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু উঠানের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে সহসা থামিয়া গিয়া যেন লজ্জার সহিত মুখটা ফিরাইয়া লইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উঠানে মিনি দাঁড়াইয়াছিল। সে যে কখন্ আসিয়াছে তাহা সঙ্গীত-চর্চ্চায় নিমগ্ন হরিচরণ বা নিতাই কাহারও লক্ষ্য হয় নাই। তাহারা আপন মনে সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, মিনি উঠানে দাঁড়াইয়া এই শিশু ও বুঁড়া-মিন্‌সের কাণ্ডকারখানা অবাক্ হইয়া নিরীক্ষণ করিতে-ছিল। হরিচরণকে লজ্জিতভাবে মুখ ফিরাইয়া লইতে দেখিয়া সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এ তোমার কি হ'চ্চে হরি-দা ?"

হরিচরণ সলজ্জ হাস্যসহকারে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। মাতার কণ্ঠস্বর শ্রবণে নিতাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চাহিল, এবং অদূরে মাতাকে সহাস্যমুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া সে অধিকতর উৎসাহের সহিত বেহালার কাঠের উপর ছড়ি টানিতে টানিতে জোরে জোরে উচ্চারণ করিতে লাগিল, পোঁ পাঁ।

মাতা স্নেহ-প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহ তিরস্কারের সহিত বলিল, "তোর মায়ের মাথা! পাজি ছেলে, আমি সাত-রাজ্যি খুঁজে মরি, আর তুমি এখানে ব'সে পোঁ পাঁ জুড়ে দিয়েছ ?"

মাতার তিরস্কারে নিতাই কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত হইল না, অথবা মাতার অজ্ঞাতসারে এখানে আসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করায় তাহার যে কিছুমাত্র অন্যায় হইয়াছে, এমনও মনে করিল না। বরং বেহালা বাজাইতে আসিয়া সে যে খুব একটা বাহাদুরীর কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য সে বলিল, "আমি গান ক'ত্তে পালি, মা গো—।"

মিনি ও হরিচরণ উভয়েই হাসিয়া উঠিল। তাহাদিগকে হাসিতে দেখিয়া নিতাই যেন একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, এবং মাতা ও হরি-

খুড়োর হাসির মধ্যে উপহাসের ভাব আছে কিনা তাহাই লক্ষ্য করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মিনি বলিল, "তুমি বুঝি ওকে সাকৃরেদ্ ক'চ্চো হরি-দা ?"

হরিচরণ বলিল, "কর্‌লে কি হ'বে, ও-ছোঁড়ার কিছু হ'বে না মিনি। ও কিছুতেই সা বল্‌তে পারে না। সাকে বলে মা, রেকে বলে লে।"

সহাস্যে মিনি বলিল, "পাঁচ বছর না গেলে ব'ল্‌তে পার্‌বে না। ছেলেদের দস্তুরই এই।"

হঠাৎ অতীতের কথা স্মৃতি-পথে আনিয়া হরিচরণ বলিল, "ঠিক কথা মিনি, তুইও ছেলেবেলায় ঐ রকম বল্‌তিস্। আমাকে ডাকৃতিস্ হলি-দা, রামকে বল্‌তিস্ আম, রান্নাকে আন্না।"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মিনি মস্তক অবনত করিল। হরিচরণ তখন নিতাইয়ের দিকে ফিরিয়া হাস্য-প্রফুল্লমুখে বলিল, "তা' বলুক্, কিন্তু গান-বাজনার ওপর ওর যে রকম ঝোঁক, তা'তে ও যদি বাঁচে তো একজন পাকা ওস্তাদ্ হ'বে, এই আমি ব'লে রাখ্‌ছি।"

পুত্রের গৌরবজনক পরিণাম শ্রবণে আনন্দে মাতার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিতাই আপনার এই গৌরবান্বিত ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্ম বুঝিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু সে উৎফুল্লভাবেই হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বল্‌তে পালি অলিকুলো, থা লে—তালপল কি অলিকুলো ?"

মিনি একটু ধমক দিয়া বলিল, "ছিঃ, হরি-খুড়ো বলে না, মামা বল।"

ধমক খাইয়া নিতাই যেন একটু দমিয়া গেল; সে ভীতি-চকিতমুখে হরিচরণের দিকে চাহিল। হরিচরণ বলিল, "তা' বলুক্ গে। এই যে গাঁ-শুদ্ধ লোক—ছেলে-বুড়ো আদি ক'রে আমাকে হরি-খুড়ো বলে।"

বলিয়া সে নিতাইয়ের দিকে ফিরিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "বল্ সা রে গা মা।"

তাহার নিকট উৎসাহ পাইয়া নিতাইয়ের মুখ হইতে ভীতির চিহ্ন অপসারিত হইল ; সে পুনরায় গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "থা লে— ।"

হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা সেই গানটা মনে আছে ? বল্ দেখি, মা গো তারা ও শঙ্করি ।"

নিতাই মাতার দিকে সলজ্জ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মা গো তালা ।"

"ও শঙ্করি ।"

"ও ছংকলি ।"

মিনি হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "বড় হ'লে কি হ'বে জানি না, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তুমি ওকে একজন ওস্তাদ্ ক'রে তুল্‌বে হরি-দা ।"

হরিচরণ হাসিল । নিতাই বলিল, "আবাল্, আবাল্, মা গো তালা ।"

মিনি বলিল, "আর মা গো তারা শেখে না এখন, খাবি আয় ।"

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "খায়নি এখনো ?"

মিনি বলিল, "না । এই তো রান্না সেরে দাদাকে ভাত দিয়ে ওকে খুঁজতে বেরিয়েছি ।"

বলিয়া সে হরিচরণের রন্ধনশালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার খাওয়া হ'য়েছে ?"

হরিচরণ উত্তর করিল, "না, হয় নি ।"

মিনি জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না হ'চ্চে নাকি ?"

মুখ মচ্‌কাইয়া হরিচরণ উত্তর দিল, "নাঃ ।"

একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে মিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া হয় নি, রান্নাও হ'চ্চে না, তবে ?"

হরিচরণ একটু হাসিল ; কিন্তু সে হাসিতে আর ক্ষণকাল পূর্ব্বের

হাসির মত প্রফুল্লতা ছিল না, তাহা যেন বিষাদের ছায়ায় মলিন। সে হাসির অর্থ বুঝিতে পারিয়া মিনি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাঁধ্‌তে পার্‌লে না, না ঘরে চাল বাড়ন্ত?"

হরিচরণ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "রাঁধ্‌তেও পার্‌লাম না বটে, আর রাঁধ্‌বার জিনিসও—"

থামিয়া গিয়া হরিচরণ মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। মিনি বলিল, "তা হ'লে চাল নাই বল। তা' চাল একসের যোগাড় কর্‌লে না কেন?"

হরিচরণ বলিল, "চাল ছিল মিনি, নেয়ে এসে উনান ধরাতে যাচ্চি, ও-বাড়ীর খুড়ী-মা এসে বল্‌লে, সেরটাক্ চাল থাকে তো দে হরি, মকদ্দমা আছে, উনি সকাল সকাল খেয়ে যাবেন। পূজো ক'ত্তে গিয়েছেন, ফিরে এসে না হয় তোর চাল দিয়ে যাব। ঘরে ঐ ক'টী চালই ছিল, ঝেড়ে তাঁকে দিলাম।"

মিনি বলিল, "তা ভৈরবখুড়ো কি এখনো পূজো ক'রে ফেরে নি?"

হরিচরণ বলিল, "ফিরেছেন বৈকি। তবে কি জানিস্ মিনি, আমি সেদিন খুড়ীমার কাছ থেকে একসের চাল ধার্ ক'রে এনেছিলাম।"

ক্রোধ-রক্তমুখে মিনি বলিল, "তাই বুঝি তিনি সেটা শোধ নিয়ে গেলেন? আর ওঁরা যে তোমার জমি জায়গা শিষ্য যজ্‌মান সর্ব্বস্ব লুটে পুটে খাচ্চেন!"

হরিচরণ এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ওঁরা তো খায় নি, পাগলের বিষয়, দয়া ক'রে দেখা শোনা কচ্চেন।"

নিতাইকে কোলে তুলিয়া লইয়া মিনি কিছুক্ষণ রোষগম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর হরিচরণের দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কথা বল্‌বো?"

হরিচরণ যেন তাহার বক্তব্যটা বুঝিয়া লইয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "না মিনি, তুই নিজেই পরের ভাতে আছিস্।"

মিনি ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লেও আমার নিজের একমুঠো পেটের ভাত আছে তো !"

হরিচরণের চোখ দুইটা যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মিনির মুখের দিকে চাহিয়া হরিচরণ আরক্তমুখে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "কেন বল্ তো, আমি তোর ভাত খেতে যাব ? তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?"

কথা শেষ করিয়াই হরিচরণ ঠিক বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ভাবে তাহার ক্রোধ-রক্ত-মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠিক সেই সময়ে হরিচরণকে ডাকিতে ডাকিতে ভৈরবখুড়া বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং রোরুদ্যমান হরিচরণের সম্মুখে মিনিকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিলেন। সে শব্দ হরিচরণের কর্ণে প্রবেশ না করিলেও মিনি তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এবং শুনিবামাত্র তাহার অর্থও বুঝিতে পারিল। বুঝিয়াই সে শঙ্কাকম্পিত-বক্ষে আস্তে আস্তে উঠানে নামিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। ভৈরবখুড়া ঘাড় বাঁকাইয়া কঠোর-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মিনি চলিয়া গেলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘাড় ফিরাইয়া হরিচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং গম্ভীরভাবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হাঁ হে হরিচরণ !

হরিচরণ চোখ দুইটা বেশ করিয়া মুছিয়া উত্তর দিল. "কেন খুড়ো ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "মিনি এমন সময় এসেছিল কেন ?"

একটুও কুণ্ঠাবোধ না করিয়া হরিচরণ উত্তর দিল, "ছেলেটা এখনো খায়নি, তাই তাকে ডাকতে এসেছিল।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ছেলেটাকে তোমার কাছে থেকে নিয়ে গেল, তাই বুঝি তুমি কাঁদছিলে ?"

হরিচরণ মৃদু হাসিল ; বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দাও খুড়ো, আমি পাগল-মানুষ, কখন্ হাসি কখন্ কাঁদি।"

"এমনি পাগল তুমি বটে" বলিয়া চক্রবর্ত্তী মুখখানা বিকৃত করিলেন। তাঁহার এই মুখবিকৃতির কারণ বুঝিতে না পারিয়া হরিচরণ আশ্চর্য্যান্বিত-ভাবে খুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি পচা পুকুরটা বেজো খাজরাকে বিক্রী কর্‌বে।"

হরিচরণ বলিল, "হাঁ, বেজোবাবু তো নেবে বলেছে।"

চক্রবর্ত্তী। তোমার এত কি অভাব যে পুকুর বেচে খাবে ?

হরিচরণ। অভাব আমার কিছু নাই খুড়ো, তবে পুকুরটা থেকেই কি হ'চ্চে ? পানার জঙ্গলে বুজে রয়েছে। ওরা নিয়ে যদি পরিষ্কার কর্‌তে পারে, তবু পাঁচজনে তো জল খেয়ে বাঁচ্‌বে।

চক্রবর্ত্তী। ওঃ, তুমি যে একজন মস্ত পরোপকারী হ'য়ে প'ড়লে দেখ্‌ছি।

তাঁহার এই তীব্র শ্লেষোক্তির উত্তর দেওয়া হরিচরণ আবশ্যক বোধ করিল না। চক্রবর্ত্তী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা দেবে ?"

হরিচরণ উপেক্ষাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "টাকার কথা কিছু জানি, যা দেয়।"

চক্র। যদি দশ টাকা দেয় ?

হরি। ভাঙা বেহালাটা সারিয়ে আন্‌তে পার্‌বো।

চক্র। যদি কিছুই না দেয় ?

হরি। সে আরও ভাল, দান ক'র্‌লে আমার পুণ্যি হ'বে।

চক্র। হুঁ, চাষার ছেলেকে দান ক'র্‌লে ভয়ানক পুণ্যি হয়!

হরি। হ'লেই বা চাষা, দানের ফল কোথায় যাবে খুড়ো ?

চক্রবর্ত্তী রোষসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "গোল্লায় যাবে। দান যা'কে তা'কে ক'র্‌লেই হ'লো ? দানের পাত্রাপাত্র আছে জান ? একজন ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল হয়, একটা মুচীকে দিলে কি সেই ফল হবে ?"

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "হবে না ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কখ্‌নো না। দানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র হ'চ্চে ব্রাহ্মণ। কেন না ব্রাহ্মণ হ'চ্চে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ, সকল বর্ণের গুরু, ব্রাহ্মণের শরীরে তেত্রিশ কোটি দেবতা বাস করেন। ব্রাহ্মণ কি সহজ লোক হে হরিচরণ। স্বয়ং ভগবান্ ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বুকে ধারণ ক'চ্চেন।"

ব্রাহ্মণত্বের মহিমা বর্ণনায় চক্রবর্ত্তীর মুখখানা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হরিচরণ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাহার সেই গর্ব্বপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা' হ'তে পারে খুড়ো, তবে আমি তো সত্যই দান ক'চ্চি না, বিক্রী ক'র্‌বো।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কিন্তু দান করা চুলোয় যাক্, তুমি ঐ চাষার ছেলেকে বিক্রীও ক'ত্তে পার্‌বে না।"

বিস্ময়-সহকারে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পার্‌বো না খুড়ো ?"

চক্রবর্ত্তী রোষ-গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিলেন, "কেন কি, ও বেটার বড্ডই আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে। দু'পাত ইংরেজী প'ড়ে এসে বেটা দেবতা

ব্রাহ্মণ কিছু মানে না, যা' খুসী তাই ক'ত্তে চায়। কাল মধু গাঙ্গুলির ছেলে হাট-পুকুরে গরুর গা ধোয়াতে গিয়েছিল, তা' বেটা তা'কে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ক'রেছে। গরু—সাক্ষাৎ ভগবতী, তার গা ধোয়াতে দেবে না, তার ওপর ব্রাহ্মণের অপমান। উচ্ছন্নে যাবে, উচ্ছন্নে যাবে! আমার কাছেও এসেছিল—আমার খিড়কীর পাড়ের জঙ্গলগুলো সাফ ক'রে দিতে চায়। বলে—পুকুর-পাড়ে জঙ্গল থাক্‌লে ম্যালেরিয়া হয়। কেন হে বাপু, আমার পুকুর-পাড়ের জঙ্গল আমি কি সাফ করাতে পারি না? আর জঙ্গলগুলো কেটে ফেল্‌লেই যেন আর ম্যালেরিয়া হ'বে না, যত ম্যালেরিয়া ঐ জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে আছে! ও একটা বাহাদুরি নেবার চেষ্টা। সে দিন আবার নায়েবের কাছে গিয়েছিল, বোস-পুকুরের পাড়ে মড়া পোড়ান বন্ধ ক'ত্তে। তা' সে মুকুন্দ ঘোষ—মুখের মত জবাব দিয়েছে। বেটা নাকি মেজেষ্টারের কাছে দরখাস্ত দেবে। দিক্ না দরখাস্ত, আমরাও সব গাঁয়ের লোক এককাট্টা, দেখি ওর মেজেষ্টর বাবা কি ক'ত্তে পারে। মেজেষ্টর মেজেষ্টরই আছে, সে তো কারো ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে তাড়িয়ে দিতে পার্‌বে না।"

এইরূপে বেজো হাজরার উদ্দেশ্যের নিন্দা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরিচরণকে সাবধান করিয়া দিলেন, খবরদার, বেজো হাজরাকে পুকুর বেচিয়া যেন তাহার অসদুদ্দেশ্যের সহায়তা করা না হয়, তাহা হইলে গ্রামশুদ্ধ লোকের বিপক্ষতাচরণ করা হইবে।

হরিচরণ কিন্তু ব্রজনাথের অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; সুতরাং সে খুড়ার কথায় সায় না দিয়া বলিল, "বেজো-বাবুর দোষ কি খুড়ো, সে তো পাঁচ জনের ভালই ক'ত্তে চায়।"

উগ্রকণ্ঠে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ওর সাত-পুরুষের মাথা ক'ত্তে চায়। বাপ-পিতামহ চোদ্দ-পুরুষ কিছু ক'ত্তে পার্‌লে না, আর চাষার ছেলে আজ

গাঁয়ের উন্নতি কর্‌বে। বলে "মোগল-পাঠান হদ্দ হ'লো, পার্শী পড়ে তাঁতি।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপহাসের উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। হরিচরণ ইহার উত্তরে ব্রজনাথের সপক্ষে বলিবার কিছু না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী তখন ব্রজনাথকে পুষ্করিণী বিক্রয় করিতে আর একবার নিষেধ করিলেন এবং যদি তাহার বিক্রয় করা নিতান্ত প্রয়োজনই হয়, তবে তিনিই উপযুক্ত খরিদ্দার দেখিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবেন এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। হরিচরণ উঠিয়া, ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া বাটীর বাহির হইল, এবং ব্রজনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে যে পুকুরটা বেচিতে পারিবে না, ইহা জানাইতে চলিল।

ব্রজনাথ তাহার আপত্তির কারণ শুনিয়া প্রথমে হাসিল, তার পর দেশের লোকগুলা—যাহারা আপনাদিগকে ভদ্র ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে, তাহাদের এইরূপ আত্মহত্যায় গভীর অনুরাগ দেখিয়া ক্ষোভে ঘৃণায় ললাট কুঞ্চিত করিল। কিন্তু সে আপনার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইল না, গ্রামের লোকদের স্বীয় মঙ্গলে এই ঔদাসীন্য তাহার সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিল। সে হরিচরণের পুকুরটা লইয়া নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় করিবার জন্য তাহাকে বেশী টাকার লোভ দেখাইল। হরিচরণ কিন্তু টাকার প্রলোভনে ভুলিল না; দৃঢ়তার সহিত জানাইল, "টাকার লোভে গাঁশুদ্ধ লোকের শত্রু হ'তে পার্‌বো না খুড়ো।"

ইহার পর ব্রজনাথ আর তাহাকে অনুরোধ করিতে পারিল না। তাহাকে বিদায় দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কিরূপ দরখাস্ত করিবে তাহারই একটা খস্‌ড়া লিখিতে বসিল।

হঠাৎ মৃদু পদক্ষেপের শব্দ শুনিয়া ব্রজনাথ ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, বিরাজ তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে যে কখন্ বাড়ীতে

আসিয়াছিল তাহা ব্রজনাথ লক্ষ্য করে নাই, এক্ষণে তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিতভাবে তাহার দিকে নেত্রপাত করিল। বিরাজও যাইতে যাইতে ঘরের ভিতর একবার চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং ব্রজনাথের উৎসুক দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সম্মিলিত হইবামাত্র দাঁড়াইয়া পড়িল। ব্রজনাথ ডাকিল, "রাজু!"

বিরাজ একটু ইতস্ততঃ করিয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এসেছিলে?"

বিরাজ উত্তর দিল, "এই একটু আগে।"

ব্রজনাথ হাতের কলমটা তুলিয়া ধরিয়া কপালে ঘষিতে লাগিল।

বিরাজ বলিল, "কেন এসেছিলাম জিগ্যেস্ কর্‌লে না?"

ব্রজনাথ সহাস্যে বলিল, "নিশ্চয়ই কিছু দরকার ছিল।"

বিরা। সামান্য কিছু দরকার নয়, খুব বড় একটা দরকারেই এসেছিলাম।

ব্রজ। তা' নইলে সামান্য দরকারে যে তুমি আস্‌বে না তা' আমি জানি।

বিরা। খুড়ী-মার কাছে গোটাকতক টাকা ধার ক'র্ত্তে এসেছিলাম।

এমনই হাস্যপ্রফুল্লমুখে বিরাজ টাকা ধার করিবার কথাটা প্রকাশ করিল যে, তদ্দর্শনে ব্রজনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাজু যে এত সহজে এমন সহাস্যমুখে স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে পারে, ইহা যেন ব্রজনাথের ধারণার অতীত ছিল; সুতরাং বিরাজের কথায় প্রগাঢ় বিস্ময় অনুভব করিয়া সে নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই বিস্ময়-বিহ্বল ভাব-দর্শনে বিরাজের যেন হাসি আসিল; উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ কোনরূপে দমন করিয়া বলিল, "তুমি কিছু মনে ক'রো না বেজো-দা, আমি একটা ভুল করেছি।"

আশ্চর্য্য-সহকারে ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভুল করেছ রাজু?"

বিরাজ বলিল, "তুমি যখন পুকুরের অংশটা বেচ্‌বার কথা বলেছিলে, আমি তখন জোর ক'রেই তাতে অস্বীকার করেছিলাম। এখন কিন্তু দেখ্‌ছি, ওটা বিক্রয় করাই ভাল।"

ব্রজ। কিসে ভাল ব'লে বুঝ্‌লে?

বিরাজ। অনেক রকমে। ওটা বিক্রী কর্‌লে কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

ব্রজ। কিন্তু সম্পত্তিটা নষ্ট হবে।

বিরাজ। ভারী তো সম্পত্তি—একটা পুকুরের সিকি অংশ। সম্পত্তিতে তো লাভের সীমা নাই। তোমার দরকার হয় নিতে পার। কত টাকা দেবে?

চিন্তিতভাবে ব্রজনাথ বলিল, "টাকা যা হয় দেওয়া যাবে, কিন্তু পুকুর বোধ হয় এখন বেচ্‌তে পার্‌বে না।"

বিরা। কেন পার্‌বো না?

ব্রজ। অনেকে বাধা দেবে।

বিরা। আমার সম্পত্তি আমি বেচ্‌লে বাধা দেবে কে?

ব্রজ। গাঁয়ের লোক।

বিরাজ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আমাকেও কি তুমি পাগল মনে করেছ বেজোদা, লোকের কথায় আমি ভুলে যাবো?"

ব্রজনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিরাজের মুখের দিকে চাহিল। তাহার এতক্ষণ সন্দেহ হইতেছিল যে, বিরাজ অন্তরালে থাকিয়া হরি খুড়োর কথা শুনিয়াছে। নতুবা কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে পুষ্করিণী-বিক্রয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া এক্ষণে উপযাচকভাবে আবার সম্মতি দিতে আসে কেন?

মানুষ নয়। সুতরাং ব্রজনাথকে হতাশ।

দেখিয়া ইহার প্রতিশোধ স্বরূপে সে

লইতেছে। বিরাজের শেষ কথায় তাহার এই সন্দেহটা নিশ্চয়তায় পরিণত হইল এবং তাহার জন্ম বিরাজের এই ত্যাগস্বীকারে সে নিজের মনে একটা আনন্দমিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথকে নীরবে হর্ষোৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরাজ যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে চঞ্চলভাবে ঘরের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রজনাথের সম্মুখে পতিত কাগজখানার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি লিখ্‌ছো?"

দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ব্রজনাথ উত্তর করিল, "ও একখানা দরখাস্ত।"

বিরাজ বলিল, "দরখাস্ত! আমি বলি বুঝি কবিতা লিখ্‌ছো।"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, "কবিতার নেশা অনেকদিন চলে গিয়েছে রাজু।"

ব্রজনাথ বেদনাজড়িত দৃষ্টিতে বিরাজের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলেও বিরাজ যেন অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, "এরি মধ্যে নেশা চলে গেল কেন ব্রজো-দা, এখনো তো বৌ আসে নি?"

ব্রজ। বৌয়ের জন্যেই কি কবিতা লিখ্‌তে হয়?

বিরা। তবে কার জন্যে লিখে?

ব্রজ। কারো জন্যেই নয়। ও একটা নেশা।

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ব্রজনাথ দরখাস্তখানার উপর দৃষ্টি স্থাপিত

বিরাজ একটুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ব্রজো-দা!"

ব্রজনাথ মুখ তুলিল। বিরাজ বলিল, "তুমি বিয়ে ক'ত্তে চাও না কেন?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ব্রজনাথ উত্তর করিল, "বাঙ্গালীর ছেলে হ'য়ে বিয়ে ক'ত্তে চাই না, এমন অসম্ভব কথা তোমাকে কে বল্‌লে রাজু?"

"খুড়ী-মা।"

"ওটা তাঁর বুঝ্‌বার ভুল।"

তাঁর বুঝ্‌বার ভুল, কি তোমার বল্‌বার ভুল তা আমি জানি না, তবে তোমার মত বয়সে কেউ যে আইবুড় থাকে না, এটা বোধ হয় ভুল নয়।"

"একটু ভুল বৈকি। এই যে হরি খুড়োর বয়স আমার চাইতে বেশী, কিন্তু তাঁর এখনো বিয়ে হয় নি।"

"ও পাগল বামুনের কথা ছেড়ে দাও।"

"পাগল্‌ হ'লেই যদি তার কথা ছেড়ে দিতে হয়, তবে মনে কর না আমিও একজন পাগল।"

বিরাজ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি পাগল!"

ব্রজনাথ বলিল, "পাগলের তো আর দু-চারটা হাত বা পা থাকে না; সকলে যা করে, তার উল্টো কাজ ক'ত্তে গেলেই পাগল হয়।"

"তুমি কি এমন উল্টো কাজ ক'চ্চো?"

"যেখানকার ছেলেরা সাবালক হ'বার আগেই ছেলের বাপ হয়, সেখানে ছাব্বিশ বছর বয়সেও আইবড় থাকা এটা সোজা কাজ কি?"

বলিয়া ব্রজনাথ বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বিরাজ মাথা নীচু করিয়া নীরবে দরজার গায়ে আঙুলের টোকা দিতে থাকিল।

একটু পরে বিরাজ হঠাৎ যেন সচেতনভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, "বেলাটা যায়, চল্‌লাম।"

বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অস্থির-পদে বাহির হইয়া গেল। ব্রজনাথ বাঁ-হাতের উপর কপালের ভর দিয়া ডান হাতে কলমটা ধরিয়া দরখাস্তখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হইয়া প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু আর একটি অক্ষরও লেখা হইল না। ব্রজনাথ দুই তিনবার দোয়াতে কলম ডুবাইয়া কালি তুলিল, এবং অন্য একটা বাজে কাগজে যাহা ইচ্ছা লিখিয়া সে কালিটুকুর সদ্ব্যবহার করিল। পরিশেষে বিরক্তভাবে কলম ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "নতুন-মা!"

বিরাজকে বিদায় দিয়া আহ্নিক শেষ করিয়া আমোদিনী তখন আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন; ব্রজনাথের ডাক শুনিয়া উত্তর দিলেন, "আমাকে ডাক্‌চিস্ বেজো?"

"হাঁ, তুমি কোথায়?"

"এই যে রান্নাঘরে।"

"আমি যাব?"

"আয় না রে।"

চটি-জুতাটা উঠানে খুলিয়া রাখিয়া ব্রজনাথ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল; এবং তেমন শেষ-বেলায় আমোদিনীকে আহারের আয়োজন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যসহকারে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ, এখনো তোমার খাওয়া হয় নি নতুন-মা?"

সহাস্যে আমোদিনী বলিলেন, "একবেলার খাওয়া—যখন হোক্ হ'লেই হ'লো বাছা।"

"একবেলার খাওয়া ব'লে একেবারে দিন কাটিয়ে খেতে হয় না কি?"

"তা হয় না। তবে আজ বিরাজ এসেছিল, তার সঙ্গে কথা কইতে অনেকটা বেলা গেল।"

ব্রজনাথ বলিল, "অনেকটা কেন, সব বেলাটাই গিয়েছে।"

মুখ মচ্‌কাইয়া আমোদিনী বলিলেন, "যাক্‌ গে বাবু, আমাদের আবার খাওয়া। পেটে একমুঠো না দিলে নয়, তাই দেওয়া।"

ব্রজ। যখন না দিলেই নয়, তখন পেটে একমুঠো দিয়ে নাও। আমি একটু পরে আস্‌ছি।

আমো। পরে আস্‌বি কেন, বোস্‌ না, তোর সঙ্গে কথা কইতে কইতে খাই।

ব্রজ। তুমি খাবে, আর আমি বসে তাই দেখ্‌বো?

ঈষৎ হাসিয়া আমোদিনী বলিলেন, "তুই খাবি?"

একটু সঙ্কুচিতভাবে ব্রজনাথ বলিল, "খেলেও হয়। কিন্তু—না আমি এখন যাই।"

বলিয়া সে যাইবার জন্ত পা বাড়াইল। আমোদিনী ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমার মাথা খাস্‌। নে, খাবি আয়।"

ব্রজনাথ দাঁড়াইল; বলিল, "কিন্তু ভাত কৈ নতুন-মা?"

নিজের ভাতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমোদিনী বলিলেন, "এই যে এত ভাত।"

"ও তো তোমার ভাত।"

দু'জনের হবে।"

"কিন্তু তোমার যে কম প'ড়্‌বে।

"পাগল! ছেলেকে ভাগ দিলে কি মায়ের কম পড়ে রে! ছেলের জন্য পেটের দিকে চাইলেই যে মায়ের পেট ভ'রে যায়।"

বলিয়া আমোদিনী ব্রজনাথের মুখের উপর স্নেহপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলেন এবং তাড়াতাড়ি থালা টানিয়া লইয়া আপনার ভাতের কিয়দংশ তুলিয়া দিলেন। ব্রজনাথ আর কোন আপত্তি না করিয়া আসনখানা টানিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সম্মুখে ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া আমোদিনী বলিলেন, "তুই একটু স'রে বোস্ বাছা, তোকে মাছ এনে দিই।"

ঘাড় নাড়িয়া ব্রজনাথ বলিল, "উঁহুঁ, যখন তোমার পাতের ভাত খাব, তখন তোমার ঐ ডাল-ভাতে, চচ্চড়ি আর অম্বল দিয়েই খাব।"

আমো। খেতে পার্‌বি?

ব্রজ। খুব পার্‌বো। না পার্‌লেও ঐ দিয়েই আমাকে খেতে হ'বে।

আমো। এত জোর ক'রে খাওয়া কেন? আমি মাছ নিয়ে আসি, নইলে তোর খাওয়াই হ'বে না।

ব্রজনাথ হাত নাড়িয়া নিষেধ করিয়া বলিল, "না নতুন-মা, দিব্যি খাওয়া হ'বে। এ মায়ের পাতের ভাত, দেবতার প্রসাদ—মাছ দিয়ে এর মাহাত্ম্য নষ্ট ক'রে দিও না নতুন-মা।"

আমোদিনীর চোখের কোণে জল আসিল। স্নেহ-গদগদ-কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা ছেলে যা' হোক্, পাতের একমুঠো ভাত—সেটা তোর দেবতার প্রসাদ হ'লো?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক ব্রজনাথ উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই হোলো নতুন-মা। মায়ের পাতের ভাত—তার মধ্যে কতখানি মিষ্টত্ব আছে, তা' বুঝ্‌বার অবসর আমার যে এই প্রথম।"

ছলছল-চোখে কথাটা বলিয়াই ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি এক গ্রাস ভাত লইয়া মুখে তুলিয়া, এবং তাহা চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হর্ষপ্রদীপ্ত-মুখে যেন তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাদ—পরিপূর্ণ [illegible] য়া লইতে লাগিল। বাঁ-হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া আমো [illegible] বসিলেন।

খাইতে খাইতে আমোদিনী বলিলেন, "আজ বিরাজ কেন এসেছিল জানিস্?"

ব্রজনাথ উত্তর করিল, "জানি, টাকা ধার ক'ত্তে এসেছিল।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে আমোদিনী বলিলেন, "তুই কার কাছে শুন্‌লি?"

ব্রজনাথ বলিল, "যে ধার ক'ত্তে এসেছিল, তার নিজের কাছে।"

"তা' হ'লে বিরাজের সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল?"

"হাঁ।"

একটু নীরবে থাকিয়া আমোদিনী বলিলেন, "ওদের কিন্তু বড্ড কষ্ট হ'য়েছে বেজো।"

মাথা নীচু করিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে ব্রজনাথ বলিল, "রোজগারী না থাক্‌লেই কষ্ট হয়।"

আমোদিনী বলিলেন, "কিন্তু ওদের যে কি হ'বে তাই আমি ভাবি। সোনা রূপো যে দু'একখানা ছিল, তা' তো শেষ হ'য়ে এল।"

ব্রজ। এখনো ভিটেটা আছে, ভাঙ্গা ঘর দু'খানা আছে।

আমো। ও-গুলো গেলে দাঁড়াবে কোথায়?

ব্রজ। গাছতলায়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমোদিনী বেদনাপ্লুত-কণ্ঠে বলিলেন, "তাই কি দু'একটা প্রাণী? দু'টো ছেলে, মাগী নিজে, তার ওপর ঐ একটা বিধবা-মেয়ে। সত্যি বেজো, মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে বুক যেন ফেটে যায়।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, "তোমার বুক ফাটলে হ'বে নতুন-মা, সমাজের বুক তো একটুও কাঁপে নি; সে ঠিক পাথরের মত শক্ত হ'য়ে র'য়েচে।"

আমোদিনী বলিলেন, "সমাজ এর কি করবে বেজো, কপালের ওপর তো কারো হাত নাই।"

ম্লান হাস্য-সহকারে ব্রজনাথ বলিল, "ঐ টুকুই আমাদের শেষ সান্ত্বনা, নতুন-মা।"

আমোদিনী বলিলেন, "দেখ্ বেজো, আজ তোকে বলি, অনেক দিন আগে উনি একবার ব'লেছিলেন, কোথায় কে নাকি বিধবা-মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। শুনে আমার এমনি রাগ হ'য়েছিল যে, সেই লোকটাকে না চিন্‌লেও তা'কে যা' মুখে এলো তাই ব'লে কত গাল দিয়েছিলাম। কিন্তু তোকে বল্‌তে কি বাছা, এই পোড়াকপালীকে দেখ্‌লেই আমার মনে হয়, আহা, এর কেউ বিয়ে দিতে পারে না!"

তীরবেগে মাথা তুলিয়া তীব্র আগ্রহের সহিত ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কথা তোমার মনে হয়, নতুন-মা?"

শান্ত কোমলকণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "মিছে বল্‌বো কেন বাছা, এক এক সময়ে সত্যিই এই কথাটা মনে আসে। কিন্তু এক একবার মনে হয়, ছিঃ, বিধবার আবার বিয়ে! তখন নিজেই মনে মনে মহাপাতকী ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিই। কিন্তু ওর মুখখান্য দেখ্‌লেই আর আমার পাপ-পুণ্যের ভয় থাকে না; মনের ভিতর থেকে কে যেন ব'লে ওঠে—আহা, এই রকম হতভাগী যারা—"

রুদ্ধশ্বাসে ব্রজনাথ বলিয়া উঠিল, "ওদের বিয়ে দিলে খুব ভাল হয়, না?"

আমোদিনী বলিলেন, "খুব ভাল না হোক্, খুব মন্দ হয় না বোধ হয়!"

উৎসাহপ্রদীপ্ত-স্বরে ব্রজনাথ বলিল, "আচ্ছা, কেউ যদি এদের বিয়ে দেবার চেষ্টা করে।"

আমো। আমি বোধ হয় তা'কে কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি।

ব্রজ। শুধু ফাঁকা আশীর্ব্বাদ করলেই তো হয় না, নতুন-মা!

আমো। তার বেশী আমাকে কি ক'ত্তে বলিস্?

ব্রজ। খুব বেশী রকম সাহায্য কিছু ক'ত্তে পার না কি?

আমো। কি রকম সাহায্য?

ব্রজ। ধর, যদি তোমার পেটের ছেলে থাকতো, তার সঙ্গে এদের বিয়ে দিতে পারতে কি?

একটু ভাবিয়া আমোদিনী বলিলেন, "অতটা বোধ হয় পেরে উঠতাম না বেজো।"

ঘাড় দোলাইয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, "আচ্ছা, নিজের ছেলের সঙ্গে না পার, সতীনের ছেলের সঙ্গে?"

সবেগে মাথা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া আমোদিনী বলিলেন, "কি বললি বেজো, কার ছেলে?"

লজ্জায় মুখখানা লাল করিয়া ব্রজনাথ সঙ্কোচজড়িত-কণ্ঠে বলিল, "আমার ভুল হ'য়েছে নতুন-মা, আমাকে মাপ কর।"

বলিয়াই সে গ্লাসের জলটা গলায় ঢালিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। আমোদিনী কঠোর তিরস্কার-পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাহার লজ্জারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ব্রজনাথ এমনই লজ্জিত হইল যে, আমোদিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার সাহস হইল না, সে লজ্জাবনত-মস্তকে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া আসিল, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। আর সকল চিন্তার মধ্যে তাহার বিধবা-বিবাহের চিন্তাটাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রবল হইয়া

আচ্ছা, বিধবা-বিবাহটা কি সমাজে চলে না? উহা যখন শাস্ত্রসিদ্ধ, তখন না চলিবেই বা কেন? চলিলে তাহাতে সমাজের ইষ্ট না অনিষ্ট? ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট তো কিছু দেখা যায় না; বরং কত ব্যভিচার—কত অত্যাচার সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে; যে নারীজাতির তপ্তশ্বাসে সমাজের সুখ-সৌভাগ্য দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহার উত্তাপের তীব্রতা অনেকটা লঘু হইয়া আসিবে। সুতরাং বিধবা-বিবাহ যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অথচ এই নিঃসন্দিগ্ধ মঙ্গলটাকে সমাজ গ্রহণ করিতে চায় না; বিদ্যাসাগরের মত শক্তিশালী মহাপুরুষ বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ ও আইনসিদ্ধ করিয়াও সমাজে চালাইতে পারিলেন না। সুতরাং উহাকে প্রচলিত করা অন্যের পক্ষে সম্ভব কি? অসম্ভব হইলেও একবার চেষ্টা দেখিতে ক্ষতি কি? ব্রজনাথ স্থির করিল, একবার চেষ্টা না দেখিয়া সে হাল ছাড়িয়া দিবে না।

কিন্তু বিধবাকে গ্রহণ করিবে এমন লোক সমাজে আছে কি? মুখে কই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিবার সাহস কয়জনের আছে? যে দুই একটা বিধবা বি

যায়, তাহাতে অর্থ বা রূপজ মোহই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়; শুধু করুণার বশবর্ত্তী হইয়া কয়টা লোক এই সকল অনাথার দুঃখ-মোচনে অগ্রসর হইতে পারে? দেশের লোকগুলার নির্ম্মমতা স্মরণে ব্রজনাথের চিত্ত যেন সমাজের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল এবং বিরক্তি ও চিন্তার ভারে মনটা যখন নিতান্ত ভারী হইয়া আসিল, তখন এই চিন্তার ভার হইতে মনটাকে মুক্ত করিবার জন্য দরখাস্তের খসড়া লইয়া বসিল।

অনেক কাটাকুটির পর দরখাস্ত শেষ হইলে ব্রজনাথ জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তায় গিরিশ সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মোকদ্দমাটা নষ্ট করিয়া দেওয়ার পর হইতে সরকার মহাশয় লজ্জায় ব্রজনাথের সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। আজ হঠাৎ তাহার সম্মুখীন হইয়া তিনি যেন অনেকটা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ব্রজনাথ এমন ভাবে কথা উত্থাপন করিল যে, সে প্রসঙ্গে সরকার মহাশয়ের লজ্জাটা আপনা হইতে চাপা পড়িয়া গেল। ব্রজনাথ তাঁহাকে জানাইলেন যে, স্বাস্থ্যোন্নতিই বর্ত্তমানে তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। একার চেষ্টায় কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না, ইহাতে সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা আপনাদের মঙ্গলে সম্পূর্ণ

ন [illegible] প ব্রজনাথ হতাশ্বাস হয় নাই, সে [illegible]

সহায়তা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছে।

সরকার মহাশয় ব্রজনাথের সাধু [illegible]

পরিশেষে [illegible]

[illegible] যে, [illegible]

হীন হইয়া পড়িতেছে, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং এদিকে [illegible] লক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য থাকিলেও তাঁহাতে মনোযোগ

দিবার অবসর কোথায়? অভাবের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতেই জীবনটা কাটিয়া গেল, অন্যদিকে মন দিবেন কোথা হইতে? নতুবা আপনার মঙ্গল সাধনে কাহার অনিচ্ছা? শুধু দায়ে পড়িয়াই সে ইচ্ছাটাকে চাপিয়া রাখিয়া অমঙ্গলের শত অত্যাচার পিঠ পাতিয়া লইতে হয়। দরিদ্রের প্রকৃতিই এই।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সরকার মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সরকার মহাশয় ব্রজনাথকে লইয়া গিয়া বাড়ীর ভিতর বসাইলেন। কমলা একখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া উঠান ঝাঁট দিতেছিল। পিতার আদেশে সে সেই ছেঁড়া কাপড়খানা টানিয়া কৈশোর-রাগ-প্রদীপ্ত অঙ্গটাকে কোনরূপে ঢাকিয়া লইল এবং ঘরের রোয়াকে মাদুর একখানা পাতিয়া দিয়া লজ্জাবনত-মস্তকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার এই সলজ্জ ভাব দর্শনে সরকার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ব্রজনাথের কাছে লজ্জা কি কম্‌লি? গোটা দুই পান সেজে নিয়ে আয়।"

কমলা পান সাজিতে চলিয়া গেল। সরকার মহাশয় ব্রজনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ তো বাবাজী, মেয়েটা চোদ্দ বছরে পড়েছে, কি ক'রে যে ওকে পার ক'র্‌বো তার ঠিক নাই। এখন মেয়ের কথা ভাব্‌বো, না দেশের কাজে মন দেব।"

ব্রজনাথও এ কথাটা অস্বীকার করিতে পারিল না। সে সরকার মহাশয়ের কথায় সায় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ের ঠিক কোথাও না?"

বলিলেন, "কোথা থেকে ঠিক হ'বে বাবা, আগে

[illegible]

হাঁকবার সময় একবার ভেবেও দেখ্‌লে না যে, ঘর ভিটে দুয়েব

কথা, আমাকে পর্য্যন্ত বিক্রী কর্‌লেও সাতশো টাকা হয় কি না সন্দেহ।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সরকার মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ব্রজনাথ নিঃশব্দে বসিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মর্ম্মবেদনার গুরুত্ব অনুভব করিতে লাগিল। সরকার মহাশয় দুঃখ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "তোমাকে বল্‌তে কি বাবা, সময়ে সময়ে এমনি মনে হয় যে, ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেলি। দেশে কত মহামারী আসে, কিন্তু এই আইবুড় মেয়েগুলোকে তো তারা ছুঁতে পারে না?"

ব্রজনাথ বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার বিষাদ-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কত দুঃখে যে স্নেহময় পিতার মুখ দিয়া এমন নির্ঘাত অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা মনে করিতেও যেন শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় কমলা পান আনিয়া সম্মুখে রাখিল। পিতার নির্ম্মম উক্তি তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য ব্রজনাথ তাহার মুখের উপর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই কমলার সজল দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। কমলা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

ব্রজনাথ একটা পান মুখে দিয়া বলিল, "বাস্তবিক সরকার মশায়, ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মে সমাজে যে সব পাপ ঢুকেছে, তার মধ্যে সব চাইতে বড় পাপ হ'চ্ছে এই কন্যাদায়। এই একটা পাপ যে অনিষ্ট করেছে, অন্য শত পাপেও তা ক'র্ত্তে পেরেছে কি না সন্দেহ। এ পাপ তাড়াতে না পার্‌লে আমাদের সমাজের উন্নতি কিছুতেই নাই।"

নৈরাশ্য-গম্ভীর-কণ্ঠে সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এ পাপকে সমাজ হ'তে কে তাড়াবে বাবা?"

ব্রজ। সমাজের সমবেত চেষ্টাতেই তা সম্ভব হ'তে পারে।

গিরি। কিন্তু তা হচ্চে কি? অনেকদিন ধ'রেই শুনে আস্‌ছি কাগজে কলমে, সভাসমিতিতে আন্দোলন চলেছে পণপ্রথা তুলে দাও। কিন্তু ফলে কিছু হ'য়েছে কি?

ব্রজ। হয় নি যে, তার কারণ আমাদের অপরিণামদর্শিতা। আজ আপনার কন্যাদায় উপস্থিত, কাজেই আপনি মনে করেন পণপ্রথাটা এই মুহূর্ত্তে উঠে যাক্‌। কিন্তু কোন রকমে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাল যখন আপনি ছেলের বাপ হবেন, তখন কি কন্যাদায়ের এই ভীষণ যন্ত্রণা আপনার মনে থাকবে? মনে থাকলেও আজকার এই যাতনার শোধ সুদে আসলে আর একজনের উপর দিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। তখন আপনি একবারও ভাববেন না, কাল হয় তো আবার আপনার এই দায় উপস্থিত হ'তে পারে। আপনার নিজের না হোক্‌, আপনার ছেলেও এক দিন এই ভয়ানক দায়ে প'ড়তে পারে।

তাহার কথায় সায় দিয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "এ কথা যথার্থ বাবা। নিজের কোলে ঝোল মাখ্‌তে গিয়ে আমরা নিজেরি সর্ব্বনাশ ক'চ্চি।"

এই কন্যাদায় লইয়া উভয়ের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। তারপর সরকার মহাশয়কে বিধাতার উপর নির্ভর করিতে বলিয়া এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্তে তাঁহাকে একটা সহি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্রজনাথ বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আসিবার সময় কমলার মলিন মুখখানা আর একবার তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই ম্লান মুখের করুণ চিত্র অন্তরে আঁকিয়া লইয়া ব্রজনাথ সহানুভূতি-বিচলিত-চিত্তে চলিয়া আসিল।

দূর হউক বিধবা-বিবাহ। এই অরক্ষণীয়া কুমারীদের জন্য সমাজ কি কোন একটা উপায় করিতে পারে না? কি উপায় করা আবশ্যক তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ব্রজনাথ অগ্রসর হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক চিন্তার পর ব্রজনাথ যখন দেখিল যে, ভাবিতে গেলে অনেক কথাই ভাবিতে হয় এবং শুধু ভাবিলে সমাজের এই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ক্ষতের কিছুমাত্র উপশম হইবে না, একজনের দ্বারা সে সমস্ত দুরারোগ্য ক্ষত আরোগ্য করাও সম্ভবপর নয়, তখন যে কাজটা তাহার পক্ষে সহজ-সাধ্য, আপাততঃ সেই আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তিতেই মনোযোগ দেওয়া শ্রেয়-জ্ঞান করিল। আগে স্বাস্থ্য, তারপর অন্য কাজ। দেহ যতক্ষণ অসুস্থ থাকে, ততক্ষণ জড়তা আসিয়া মানুষকে কার্য্যবিমুখ করিয়া রাখে; সহস্র প্রেরণাতেও তাহার কর্ম্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। কিন্তু দেহ সুস্থ থাকিলে আপনা হইতেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া মানুষের শক্তিকে কার্য্যের দিকে নিয়োজিত করিয়া দেয়। তেমনই সমাজ স্বাস্থ্যবলে বলীয়ান্ হইলে সে নিজেই নিজের ভিতরের দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং ব্রজনাথ সর্ব্বাগ্রে সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির মনোযোগী হইল এবং দরখাস্তখানা শেষ করিয়া তাহাতে গ্রামের লোকের সহি লইতে চেষ্টিত হইল।

কিন্তু এই সহি পাওয়া কাজটা যে এত কষ্টসাধ্য, ইহা ব্রজনাথ আগে বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিল, যখন অনেকেই সহি দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কেহ উপস্থিত সময়াভাবের দোহাই দিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল, কেহ জানাইল, ঘরে দোয়াত কলম নাই। যাহারা নিতান্ত স্পষ্টবাদী, তাহারা বলিল, "আচ্ছা, বুঝে দেখি।" তাহা-দিগের এই বুঝিয়া দেখিবার অর্থ ব্রজনাথ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, ইহার মধ্যে বুঝিয়া দেখিবার জন্য

কিছুই নাই, সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে লিখিত এই দরখাস্তে নামটা সই করিয়া দিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

সকলে কিন্তু এত সহজে কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিল না। কেন না, ভৈরব চক্রবর্ত্তী, মুকুন্দ ঘোষ প্রভৃতি আইনজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মেজেষ্টরের কাছে দরখাস্ত, তাহাতে সহি দিলে, পরে অনেক বেগ পাইবার সম্ভাবনা। হয় তো মেজেষ্টরের কাছে সাক্ষী দিতে ছুটিতে হইবে, না গেলে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে, পুলিশ আসিয়া টানাটানি করিবে। তা' ছাড়া ঐ ইংরাজী লেখাগুলায় কি আছে কে জানে; মতি হাজরার ছেলেকে বিশ্বাস কি? না জানিয়া শুনিয়া কাগজে সহি দিলে শেষে ধন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে কি না কে বলিতে পারে! সাদার পিঠে কালি চড়ান কি সহজ কথা।

সহজ নয় বলিয়াই সকলে সাদার পিঠে কালি চড়াইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শুধু যাহাদের চক্ষু-লজ্জাটা খুব বেশী, এবং ব্রজনাথের সহিত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ছিল, তাহারাই না বলিতে পারিল না, একটু ইতস্ততঃ করিলেও সহি দিতে বাধ্য হইল। অপর সকলে এবেলা নয় ওবেলা, আজ নয় কাল করিয়া ব্রজনাথকে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিল। ব্রজনাথ ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেও ঠিক পিতৃমাতৃদায়গ্রস্তের ন্যায় দরখাস্ত লইয়া লোকের দরজায় আনাগোনা করিতে থাকিল। তিন চারিদিনেও তাহার এই হাঁটাহাঁটির অবসান হইল না।

দিনে, দুপুরে, সকালে, সন্ধ্যায় এইরূপে হাঁটাহাঁটি করিতে করিতে ক্রমে ব্রজনাথের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, দূর হউক, দরখাস্তখানাকে ছিঁড়িয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেয়।

[illegible] ইচ্ছা করিয়া মরিবে এবং মরণের দ্বারে

দিবে না, তাহাদের সাধের মরণে বাধা দিয়া কল [illegible]? [illegible] বারবার

জন্তই জন্মিয়াছে, মরিয়া জন্মের উদ্দেশ্য সার্থক করুক্। কিন্তু শুধু যদি ভদ্রনামধারী এই হীন স্বার্থপরায়ণ লোকগুলা মরিয়া পৃথিবীর ভার লঘু করিত, তবে তাহাতে বাধা দিবার জন্ত ব্রজনাথের একটুও আগ্রহ হইত না। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে আর যে লোকগুলা মরিতেছে, তাহারাই যে দেশের—জনসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ; সেই সরলপ্রাণ পরিশ্রমী ইতর আখ্যায় অভিহিত লোকগুলার অকাল-মৃত্যুতে দেশের মেরুদণ্ড যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! সেই নীরব কর্ম্মীদের বিলোপে বাংলার গৌরব লোপ পাইতে বসিয়াছে! সুতরাং তাহাদিগকে এই অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতেই হইবে। তাহারা নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত নিরীহ। অসহায় নিরীহ ইতর শ্রেণীকে বাঁচাইবার জন্তই ব্রজনাথকে সকল ক্রোধ—সকল বিরক্তি দমন করিতে হইল। সে স্থির করিল, যদি আজ অপর কাহারও সই না পাই, তবে এইরূপ জনকতক চাষাভূষার সহি লইয়াই দরখাস্ত পাঠাইয়া দিব।

এইরূপ স্থির সঙ্কল্প লইয়া, সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া ব্রজনাথ যখন বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল, তখন আমোদিনী তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেরিয়ে যাচ্চিস্ নাকি ব্রেজো?"

জামার বোতাম আঁটিতে ব্রজনাথ উত্তর দিল, "হাঁ।

আমো। আজ আবার কি কাজে যাচ্চিস্?

ব্রজ। যে কাজে রোজ যাই।

আমো। ভালা এক কাজ পেয়েছিস্ যা' হোক্। বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।

যদি ঘরের খেয়ে

থাকে, তবে বনের

জুতে ব

খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তারাই তাঁড়াতে যাবে। না বাবা, এর চাইতে তোর ক'ল্‌কাতায় চাক্‌রী-বাক্‌রী করা ঢের ভাল ছিল।"

ব্রজনাথ বলিল, "কিন্তু চাকরী ক'ত্তে কৈ দিলে নতুন-মা ?"

গম্ভীর-মুখে আমোদিনী বলিলেন, "সেটা আমার খুব অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু তিনি স্বর্গে গেলেন, তুই যাবি চাকরী ক'ত্তে, আমি কা'কে নিয়ে ঘরে থাকি বল্‌ তো ?"

ব্রজনাথ নীরবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আমোদিনী বলিলেন, "তখন কি আমি জান্‌তাম যে, কোম্পানীর চাকরীর বদলে তুই এমন টো টো কোম্পানীর চাকরী পাবি। ভাত একমুঠো পেটে দিয়ে না বসা, না শোওয়া, এই দুপুরের রোদে গাঁয়ের এ-মাথা ও-মাথা ছুটোছুটি। আচ্ছা, একদিন কি জিরুতেও নাই ?"

ব্রজনাথ বলিল, "আজকার দিনটা ঘুরে এসে কাল থেকে জিরুব নতুন-মা।"

ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে থাকিয়া আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি না বেরুলেই নয় ?"

ব্রজ। আজ বেরুতেই হবে।

আমো। ফিরে আস্‌বি কখন্‌ ?

ব্রজ। গোটা-পাঁচেক সই আদায় হ'লেই ফিরে আস্‌বো।

আমো। সই টই আমি জানি না, পাঁচটার সময় ফির্‌তে পার্‌বি ?

ব্রজনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "সে টা ঠিক কেমন ক'রে বলি।"

তর্জ্জন করিয়া আমোদিনী বলিলেন, "যেমন ক'রে হোক্‌, ফির্‌তেই হবে। না ফির্‌লেই নয়, বুঝেছ ?"

বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। ব্রজনাথ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "না ফির্‌লেই নয়—এমন কি দরকার আছে নতুন-মা ?"

আমোদিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দরকার না থাক্‌লে ব'ল্‌বো কেন ?"

ব্রজনাথ বলিল, "দরকারটা শুন্‌তে পাই না কি ?"

আমোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রজনাথের মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি-নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, "আচ্ছা, শোনাচ্চি। সেই একটি পরমা-সুন্দরী মেয়ের কথা ব'লেছিলাম, তা'রা আজ তোকে দেখ্‌তে আস্‌বে।"

ব্রজনাথের মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। বলিল, "আজ আস্‌বে ?"

আমো। হাঁ, আজ।

কুণ্ঠিতস্বরে ব্রজনাথ বলিল, "আমাকে আগে জিজ্ঞাসা না ক'রে ভদ্রলোকদের মিছে কেন কষ্ট দিলে নতুন-মা ?"

সহসা যেন একটা কঠোর আঘাত পাইয়া আমোদিনী বিষণ্ণমুখে বলিয়া উঠিলেন, "মিছে কষ্ট দিলাম কি রকম ?"

ব্রজনাথ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। আমোদিনী তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি বিয়ে কর্‌বি না ব্রজ ?"

ব্রজনাথ নিরুত্তর। আমোদিনী অশ্রুকাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ—আজও তুই তাকে ক্ষমা ক'ত্তে পার্‌লি না ?"

তাঁহার চোখের কোল বাহিয়া কয়েক-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ব্রজনাথ ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "না না নতুন-মা, বিয়ে আমি নিশ্চয় কর্‌বো। তবে সে সুন্দরী নয়, বড় লোকের মেয়েও নয়।"

আগ্রহের সহিত আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কার মেয়ে ব্রজ ?"

"ফিরে এসে বল্‌বো" বলিয়াই ব্রজনাথ ঝড়ের মত ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া গেল। আমোদিনী ব্যথিতচিত্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এ কথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। নায়েব মহাশয় চোখ টিপিয়া অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় বলিলেন, "বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না কি? কথাতেই আছে—'ওরে হরিণ তোরে কই, সময়-গুণে সকল সই।' সেদিনকার ছোকরা বেজো হাজরা, সে যে আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবে, মুকুন্দ ঘোষ সেটা চুপ ক'রে ব'সে দেখ্‌তে পার্‌বে না।"

ঘোষজার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে, ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বিলম্ব হইল না। ব্রজনাথের উদ্দেশ্য পণ্ড করিতেই তিনি যে ডেপুটী-বাবুর অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন, ইহা অনুমান করিয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘোষজার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নায়েব মহাশয় কিন্তু এ সকলই শ্রীহরিরই ইচ্ছা বলিয়া, আপনার প্রাপ্য প্রশংসাটী শ্রীহরির স্কন্ধে অনায়াসেই অর্পণ করিয়া দিলেন।

এদিকে ব্রজনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, নায়েব মহাশয় মুক্তকণ্ঠে তাহার সাধুবাদ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বাবাজী, মতি হাজরার ছেলে বটে! একবারেই মেজেষ্টার সাহেবের কাছে দরখাস্ত! বাপু, আমাদের তো সাহেব স্থবোর নামেই গায়ে কাঁটা দেয়। হাঁ, লেখাপড়া যা' শিখেছিলে তা' সার্থক। এক কথায় মেজেষ্টার সাহেবের মনটাকে এমনই ভিজিয়ে দিলে যে, সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটীর উপর তদন্তের হুকুম। গাঁয়ের মধ্যে ছেলে একটী জন্মেছিলে বটে!"

তাহার এ প্রশংসাবাদে কিছুমাত্র উৎফুল্ল না হইয়া ব্রজনাথ সবিনয়ে উত্তর করিল, "আমার যতটুকু সাধ্য আমি করেছি। এখন আপনাদের হাত। আপনারা পাঁচজনে যদি—"

তাহাকে বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই নায়েব মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কারো দরকার নাই বাবাজী, কারো দরকার নাই। তুমি

একাই একশো। গাঁয়ের পাঁচজন,—গাঁয়ে আবার মানুষ আছে কে! মানুষের মধ্যে মানুষ ছিল এক মতি হাজরা, আর এখন দেখ্‌ছি এতবড় গাঁয়ের ভিতর একটা মানুষ আছে—মতি হাজরার ছেলে ব্রজ হাজরা।"

ব্রজনাথ লজ্জাবনত-মস্তকে বলিল, "আপনাদের কাছে আমি! এমন কথা বল্‌বেন না।"

সবেগে কেশবিরল মস্তকটাকে আন্দোলন করিয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন, "দু'শো বার বল্‌বো, হাজার বার বল্‌বো। এই যে গাঁয়ের ভিতর এতগুলা লোক আছে—মড়া পোড়ান পুকুরের জল খেলে যে ম্যালেরিয়া হয়, এই সোজা কথাটা তো কারো মাথাতেই আসে নি? আস্‌বে কোথা থেকে? পেটে বিদ্যে থাক্‌লে, মাথায় বুদ্ধি থাক্‌লে তবে তো আস্‌বে।"

নায়েব মহাশয়ের এই অতিরিক্ত প্রশংসাবাদের অন্তরালে যে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা ব্রজনাথ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া, নায়েব মহাশয়ের এই উদারতা-পূর্ণ প্রশংসাসূচক উক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টিত হইল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া, নায়েব মহাশয় ধীর-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা,—তুমি এ গাঁয়ের লোকদের চেন না বাবাজী, এরা সাপ হ'য়ে খায়, ওঝা হ'য়ে ঝাড়ে। আমি এই দশ বছর এদের দেখে আস্‌ছি। এই যে তুমি গাঁয়ের উন্নতির জন্য এত চেষ্টা ক'চ্চো, কিন্তু গাঁয়ের একটা লোকও তোমার স্বপক্ষে আছে মনে কর কি? বরং ভিতরে ভিতরে তোমার অনিষ্টের চেষ্টাই কর্‌ছে।"

মৃদু হাসিয়া ব্রজনাথ বলিল, "তা' করুক্, আমার কর্ত্তব্য যা', আমি তা' ক'রে যাব।"

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে নায়েব মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ব্যস্, ব্যাটা-ছেলের

কথাই ত' এই। আমারও ঠিক এই মত বাবাজী। 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' গোবিন্দ হে, সকলই তোমার ইচ্ছা!"

গোবিন্দের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে নায়েব মহাশয়ের গম্ভীর মুখখানা ভক্তির প্রগাঢ়তায় যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! এই প্রফুল্লতার অন্তরালে যে কোনরূপ কুটিল উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, ব্রজনাথকে তাহা বুঝিবার অবসর মাত্র দিলেন না। ব্রজনাথও তাঁহার এই সাধুতায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে তখন ডেপুটী-বাবু আসিলে কি করিতে হইবে, তাঁহার কিরূপ আদর অভ্যর্থনা করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। নায়েব মহাশয় তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, সে জন্ম ব্রজনাথের কিছুমাত্র চিন্তা নাই, যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সে সকল তিনিই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। তিনি থাকিতে যদি ব্রজনাথকে ভাবিতে হয়, তবে তাঁহার থাকা না থাকা যে সমান। গাঁয়ের লোক যাহা করে করুক, তিনি কিন্তু ব্রজনাথের হিত-চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

নায়েব মহাশয়ের সহৃদয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও তাঁহার এই হিতৈষিতার জন্ম ব্রজনাথ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, এবং ডেপুটী-বাবু তদন্তে আসিলে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সে সকলের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে বেজো, তোর ডিপুটী-বাবু এসে গাঁ তোলপাড় ক'চ্চে, আর তুই ঘরে ব'সে র'য়েছিস্?"

ঈষৎ হাসিয়া ব্রজনাথ উত্তর করিল, "কি ক'র্‌বো? ডিপুটী-বাবুর পিছনে পোষা-কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি?"

সহাস্যে আমোদিনী বলিলেন, "শুন্‌তে পাই, গাঁয়ের যত মাতব্বর লোক সেই রকমই ঘুরে বেড়াচ্চে।"

ব্রজনাথ বলিল, "আমি তো মাতব্বর লোক নই, নতুন-মা।"

আমো। মাতব্বর না হ'লেও তুই তো দরখাস্ত ক'রে আনিয়েছিস্।

ব্রজ। আনিয়েছি ব'লে দিন-রাত হুজুরের কাছে যোড়হাত ক'রে ব'সে থাক্‌তে হবে নাকি? আমি সাধারণের উপকারের জন্য দরখাস্ত ক'রেছিলাম, সরকারের হুকুমে ডিপুটী-বাবু তদন্ত ক'ত্তে এসেছেন। এখন সাধারণে তাঁকে বুঝিয়ে দিক্, কিসে তাদের উপকার, কিসে অপকার।

আমো। বোঝাবে কে? মতি চাঁড়াল, ধনা বাগ্দী?

ব্রজ। তা' নয় তো আমি একা বোঝালে কিছু হবে কি? সকল-কেই হাকিমের কাছে গিয়ে আপনাদের দুরবস্থা জানাতে হবে।

আমোদিনী ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "সে কথা বোঝাবার শক্তি তাদের থাক্‌লে তারা কি এতকাল মুখ বুজে সব কষ্ট স'য়ে থাকে? তুই দেখ্‌ছি নেহাৎ ছেলে-মানুষ।"

নতুন-মার এই তিরস্কারে ব্রজনাথ একটু লজ্জা অনুভব করিল। আমোদিনী বলিলেন, "যাদের উপকারের তরে তুই এত কাণ্ড ক'রেছিস্, তাদের কি রকম ক্ষতি হ'চ্চে, একবার ঘুরে দেখে আয় দেখি। তারা যে

এখন হ'হাত তুলে শুধু তোকে নয়, তোর বাপ্ চোদ্দ-পুরুষকে পর্য্যন্ত অভিশাপ দিচ্ছে।"

ব্রজনাথ বিস্ময়ে চমকিত হইয়া নতুন-মার মুখের দিকে চাহিল; জিজ্ঞাসা করিল, "তাদের কি ক্ষতি হ'চ্চে ?"

আমোদিনী বলিলেন, "তাদের ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, গোয়ালের পাঁঠাখাসী—সব যে উজাড় হ'য়ে গেল।"

"কে উজাড় ক'ল্লে ?"

"তোমার ডিপুটী-বাবু, আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ।"

"জোর ক'রে নিচ্ছে ?"

"দাম দিয়ে নিলে তাদের ক্ষতি হবে কেন ? আর বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে তোকে শাপ-শম্পাত দিতে আস্‌বে কেন ?"

ব্রজনাথ ক্রোধ-গম্ভীর-মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। আমোদিনী বলিলেন, "এই খানিক আগে মতি চাঁড়ালের বোন্ এসে কত কান্নাকাটী ক'রে গেল; শুধু কান্নাকাটী কেন, সেই সঙ্গে বেশ পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়্‌লে না।"

রোষ-প্রদীপ্ত-কণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, "বটে।"

আমোদিনী বলিলেন, "তা' তার শোনাবারই বা অপরাধ কি ? গরীব-লোক—কাল একটা পাঁঠা নিয়ে গিয়েছে, আজ আবার সাত টাকা দামের খাসীটা নিয়ে গিয়ে কেটে খেয়েছে।"

ব্রজনাথের মুখখানা ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমোদিনী অনুমানে তাহার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা' হাকিম হুকিম গাঁয়ে এলে এই রকমই হ'য়ে থাকে; ওরা তো নিজের পয়সা খরচ ক'রে খাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে দোষটা তোর ঘাড়েই প'ড়েছে, কেন — [illegible] খাল কেটে কুমীর এনেছিল্।"

ব্রজনাথ ক্রোধ-গম্ভীর-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আচ্ছা, কুমীরের এ অত্যাচারের প্রতিবিধান হয় কি না দেখি।"

বলিয়াই সে অস্থির-পদে বাহির হইয়া গেল এবং একেবারে চাঁড়াল-পাড়ায় উপস্থিত হইয়া কাহার কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বেশী অনুসন্ধান করিতে হইল না, পল্লীতে উপস্থিত হইলেই পাড়ার অনেকেই আসিয়া তাহার নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল যে, কাহারও ডিম্ব-সহিত হংস অপহৃত হইয়াছে, কাহারও ছাগপাল নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে, কাহারও সযত্নে পালিত খাসীটী বল-পূর্ব্বক গৃহীত হইয়া হাকিমের উদরে প্রবেশ করিয়াছে, কেহ বা ক্ষেতের ফসল বিনামূল্যে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। কি কুক্ষণেই বেজো-বাবু মাঠ-পুকুরের সংস্কারজন্য হাকিমের কাছে দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহার ফলে আজ তাহাদিগকে এই সকল ক্ষতি ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে।

ব্রজনাথ ক্রোধে ক্ষোভে নিজের হাত নিজে কামড়াইতে লাগিল। সে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটীর নিকট যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু এই ক্ষতির পর আরও অধিকতর লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইবে বলিয়া কেহই যাইতে স্বীকৃত হইল না; সকলেই আপনাদের দুরদৃষ্টের উল্লেখ করিয়া আপাততঃ সেই নিষ্ঠুর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকাই যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিল। অগত্যা ব্রজনাথ অত্যাচারী ডেপুটীর উপর ঘৃণা ও এই সকল নির্ব্বোধ অধিবাসীদের উপর তীব্র-বিরক্তি লইয়া একাই ডেপুটীর নিকট উপস্থিত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ডেপুটী-বাবু তখন মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর বাহিরে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে দরখাস্তের লক্ষ্যীভূত পুষ্করিণীটী পরিদর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু নায়েব মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে, এই অপরাহ্নের রৌদ্র ভোগ করিয়া তাঁহার সেখানে যাইবার আঁপাততঃ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এইখানে বসিয়াই উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের কথার উপর নির্ভর করিলে তিনি গ্রামের কাক-পক্ষীরও অব্যবহার্য্য সেই 'মজা' পুকুরটার সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। ভৈরব চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ ভদ্রলোকেরাও ডেপুটী-বাবুকে ঘেরিয়া সমস্বরে নায়েব মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছিলেন। মধ্যাহ্নে নধর ছাগলদলের সুললিত মাংসে পরিপূর্ণ উদরটাও তখন এত ভার বোধ হইতেছিল যে, এ সময়ে সেই গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী পচা-পুকুরটা পরিদর্শন করা অপেক্ষা তাহাকে জাহান্নমে পাঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত মন্দ বোধ হইতেছিল না; সুতরাং এই সকল ভদ্রলোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে তাহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইবে কি না গম্ভীরভাবে ইহাই চিন্তা করিতে করিতে চুরুটে মৃদু-মন্দ টান দিতেছিলেন।

এমন সময় ব্রজনাথ যেন রুদ্র-মূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং রোষ-কঠিন-স্বরে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি জান্‌তে চাই, আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন?"

ডেপুটী-বাবু তাহার মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, গম্ভীর-স্বরে উত্তর করিলেন, "আমিও জান্‌তে চাই, তোমার এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ বলিল, "আমার প্রশ্ন অতীব সঙ্গত, এবং সে সঙ্গত প্রশ্নের উদ্দেশ্য, আপনি স্বীয় কর্ত্তব্যের অন্যায় অবমাননা ক'চ্চেন।"

ডেপু। তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট অপমানজনক বোধ হ'লেও জিজ্ঞাসা করি, কিসে তুমি আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখ্‌তে পেয়েছ ?

ব্রজ। আপনি আইনের রক্ষক হ'লেও আপনার দ্বারা আইন অনাদৃত হ'চ্চে।

ডেপু। ইহা নিতান্ত নির্লজ্জ মিথ্যা উক্তি।

ব্রজ। আমি আনন্দের সহিত এ অপবাদ স্বীকার ক'রে নিতে পার্‌তাম, যদি একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারা এরূপ অন্যায় অত্যাচার সত্যই হ'তো।

রোষরুদ্ধ-কণ্ঠে ডেপুটীবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অত্যাচার !"

সকলেই এতক্ষণ ঔৎসুক্যসহকারে উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, এবং ইংরাজী কথোপকথনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও তাহার মধ্যে ক্রোধের ভাব যে যথেষ্ট রহিয়াছে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছিল। এক্ষণে ডেপুটীবাবুর সক্রোধ চীৎকার শ্রবণে সকলেই যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। নায়েব মহাশয় বসিয়াছিলেন, বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য সকলে ভীতিচকিত-দৃষ্টিতে ডেপুটীবাবুর মুখের দিকে চাহিল।

ডেপুটীবাবু ক্রোধগম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তার পর তাঁহার দ্বারা কি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাই জানিতে চাহিলেন। উত্তরে ব্রজনাথ নির্ভীকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র অধিবাসীদিগের অভিযোগ-কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া ডেপুটীবাবু যেন একটু লজ্জিতভাবেই বলিলেন, "যদি তোমার এ অভিযোগের মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকে,

তবে সেজন্ত আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু আমার বিশ্বাস—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া নায়েব মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "হু'শোবার—হাজারবার মিথ্যা। রাধেশ্যাম! অতিবড় পাষণ্ড না হ'লে গরীবের উপর এমন অত্যাচার কেউ ক'ত্তে পারে? আহা, গরীব প্রজা, এক বেলা জোটে তো এক বেলা জোটে না। জোর ক'রে তাদের পাঁঠা-খাসী কেড়ে লওয়া—রাধেশ্যাম, রাধেশ্যাম!"

ঘৃণায় নায়েব মহাশয়ের মুখখানা এমন বিশ্রীভাবে কুঞ্চিত হইয়া আসিল যে, তদ্দর্শনে হাস্ত সম্বরণ করা অনেকের পক্ষেই দুষ্কর হইয়া উঠিল। নায়েব মহাশয় কিন্তু স্বীয় উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ডেপুটীবাবুকে সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য করিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ গোমস্তা হরিধন দত্তকে ডাকিয়া সত্য সত্যই নিরীহ প্রজাদের উপর এরূপ অন্যায় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোমস্তা হুজুরের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্পষ্টভাবে জানাইল যে, কোন প্রজার উপরেই বিন্দুমাত্র জোর-জবরদস্তি করা হয় নাই। গোবরা মালিকের যে খাসীটী কাল রাত্রে আনীত হইয়াছিল, তাহার মূল্য নগদ পাঁচটাকা বারো আনা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। আজ গোপাল ঘোড়ুয়ের পাঁঠাটী ওজনে তিনসের সাড়ে তিন সেরের অধিক না হইলেও উহার দাম আড়াই টাকা লইয়া সে বিক্রয় করিয়াছে। খাতায় তন্ন-তন্নভাবে এ সকল খরচ লেখা আছে। হুজুর ইচ্ছা করিলে খাতা দেখিতে পারেন।

নায়েব মহাশয় কিন্তু খাতা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, হুজুরের দেশব্যাপী সুনামের উপর যে কলঙ্ক-কালিমা অর্পিত হইয়াছে, তাহার ক্ষালনার্থ তিনি অভিযোক্তা প্রজাদের ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাহাদের জিনিষ-পত্রের দাম না দিয়া জোর করিয়া লওয়া হইয়াছে

কি না, তাহাই সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতারের সম্মুখে বিবৃত করিবার জন্য দিলেন।

নায়েব মহাশয়ের রক্তচক্ষু, ডেপুটীবাবুর গম্ভীরমূর্ত্তি, তদুপরি অদূরে দণ্ডায়মান গোমস্তা হরিধন দত্তের তীব্র ভ্রূকুটী তাহাদের মনের ভিতর এমন একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল যে, তাহারা কি করিবে, কি বলিবে, প্রথমতঃ তাহাই ভাবিয়া পাইল না; পরিশেষে উপস্থিত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে যখন স্থির করিয়া ফেলিল যে, এরূপস্থলে সত্য কথা বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়, বলিলে একটা পাঁঠা বা খাসীর বিনিময়ে তাহাদের জানবাচ্চার উপর পর্য্যন্তও টান পড়িবে, তখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে, তাহাদের উপর কেহ কিছুমাত্র জোর-জবরদস্তি করে নাই, তাহারা স্বেচ্ছায় উচিত মূল্য লইয়া আপনাদের জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিয়াছে।

হুজুরের সুনাম রক্ষিত হওয়ায় সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। ডেপুটীবাবু ব্রজনাথের মুখের উপর তিরস্কারসূচক কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ব্রজনাথ লজ্জায় মস্তক নত করিল। উঃ, কি ভীরু—কি মিথ্যাবাদী এই লোকগুলা! ইহারা স্বার্থরক্ষার জন্যও সত্য বলিতে অক্ষম। ক্রোধে ক্ষোভে ব্রজনাথ ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, ঘৃণায় অপমানে তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে থাকিল।

আর কেহ না বুঝিলেও নায়েব মহাশয় তাহার অবস্থা অনুমানে বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া তিনি সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "হুজুর, এ ক্ষেত্রে বাবাজীর দোষ কিছুই নাই, এ সব শত্রুপক্ষের চক্রান্ত। এখানে শত্রুর তো অভাব নাই—বাবাজীরও নাই, আমারও নাই। তারাই এইগুলো রটিয়ে বাবাজীর কাণ ভারী ক'রে দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য, এই রকম একটা গোলযোগ বাধিয়ে আসল কাজটা পণ্ড করা। তা' বাবাজী

নেহাৎ ছেলে-মানুষ কি না, তাই একেবারে হুজুরের সাম্‌নে এসে মুখের উপর এতবড় কথাটা—ছি ছি, অন্যায় হ'য়েছে, হু'শো বার অন্যায় হ'য়েছে। তা' ছেলে-মানুষ—বাবাজীর হ'য়ে আমিই হুজুরের কাছে এর জন্য মাপ চাইচি।"

সবেগে মাথা তুলিয়া উদ্ধত-কণ্ঠে ব্রজনাথ বলিয়া উঠিল, "কিছুমাত্র দরকার নাই নায়েব মশায়, আমি এমন একটুও অন্যায় করি নাই, যার জন্য আমার প্রতিনিধি হ'য়ে আপনাকে মাপ চাইতে হবে। তবে আমার অন্যায় এইটুকু যে, এই সব হতভাগা—যারা নিজেদের ওপর অত্যাচারের কথাতে মুখ ফুটে বল্‌তে ভয় পায়, তাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতি-বিধান ক'র্ত্তে এসেছিলাম। তখন জান্‌তাম না যে, এরা এত কাপুরুষ।"

ব্রজনাথের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; সে গভীর ঘৃণা-বিমিশ্র-কণ্ঠে বলিল, "কাপুরুষ শুধু এরা নয়, যারা এদের উপর অত্যাচার ক'রেছে, তারাও আবার এদের চাইতে কাপুরুষ। তারা এত হীন যে, আপনাদের প্রবল জ্ঞানে দুর্ব্বলের উপর যে অত্যাচার করে, সে অত্যাচারের কথা মুখ ফুটে বল্‌তে সাহসী হয় না, নিতান্ত নির্লজ্জের মত মিথ্যার আবরণ দিয়ে সেটাকে ঢেকে ফেল্‌বার চেষ্টা করে।"

একবার ডেপুটীর এবং আরবার নায়েব মহাশয়ের মুখের উপর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ব্রজনাথ সে স্থান ত্যাগ করিল। ডেপুটী-বাবুর সহিত সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ডেপুটী-বাবু গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। তিনি গ্রামত্যাগ করিলেও তাঁহার স্মৃতি অনেকদিন পর্য্যন্ত গ্রামখানাকে সজাগ করিয়া রাখিল। মাসখানেক ধরিয়া তাঁহার ঘোড়াটার উচ্চতা ও মূল্য সম্বন্ধে খুব তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল; তারপর তাঁহার আগমনের ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকিল। এমন

দুই পরে নায়েব মহাশয় অনেক অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন যে, ডেপুটী-বাবু দরখাস্তের উত্তরে উপরওয়ালার নিকট মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, দরখাস্তের লক্ষ্যীভূত পুষ্করিণীর সংস্কারের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; আবেদনকারীগণ অসদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই এইরূপ আবেদন করিয়াছিল। জমিদারের খাস-পুষ্করিণীটীকে অধিকারে আনাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহার সহিত গ্রামের কোন ভদ্রলোকেরই সহানুভূতি নাই, বরং অনেকেই ইহার বিরুদ্ধবাদী।

নায়েব মহাশয়ের প্রমুখাৎ ডেপুটী-বাবুর মন্তব্য শ্রবণে গ্রামের অনেক লোকই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, এবং অনর্থক এইরূপ গোলযোগ বাধাইবার জন্য ব্রজনাথের নির্ব্বুদ্ধিতার উপর দোষারোপ করিতে লাগিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গাঁয়ের উন্নতিটা কতদূর হ'লো বেজো-দা?"

ম্লান হাস্যসহকারে ব্রজনাথ উত্তর দিল, "উন্নতি নয়—অবনতি কতদূর হ'লো তাই জিজ্ঞাসা কর।"

বিরাজ মৃদু হাসিল; বলিল, "তুমি এবার উন্নতি ছেড়ে অবনতির পথ ধ'রেছ নাকি?"

ব্রজনাথ বলিল, "সকলেই যখন সেই পথে যেতে চায়, তখন আমি একাই পিছনে প'ড়ে থাকি কেন রাজু?"

ব্রজনাথ একটু হাসিল; কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে অন্তর্নিহিত বেদনার

যে একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল, সেটাকে সে কিছুতেই চাপিতে পারিল না। বিরাজ তাহার হাসিটুকু দেখিল, দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ শব্দটুকুও শুনিল। শুনিয়া সে একটু ব্যথিত-স্বরেই বলিল, "এ কথাটা তোমার ঠিক্ হ'লো না বেজো-দা।"

ব্রজ। কিসে বেঠিক্ হ'লো?

বিরা। আর সকলে যা' ক'র্‌বে, তুমিও কি তা'তেই সা'য় দিয়ে যাবে?

ব্রজ। কাজেই সা'য় দিতে হবে। না দিলে দশজনের কাছে আমিই পাগল প্রতিপন্ন হ'ব।

বিরা। তোমার মুখেই গল্প শুনেছি, কে একজন ইংরেজ পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ ক'চ্চে ব'লেছিল ব'লে তাকে সকলে পাগলা-গারদে দিতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষে তার মতই সকলকে মেনে নিতে হ'য়েছে। কি নামটা তাঁর?

ব্রজ। গ্যালিলিও। সর্ব্বনাশ! তুমি আমাকে গ্যালিলিওর মত একজন বড়লোক মনে কর রাজু?

বিরা। মানুষ ততক্ষণ আপনাকে চিন্‌তে পারে না বেজো-দা, যতক্ষণ না তার ভিতরের শক্তিটুকু বাইরে সম্পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে। গ্যালিলিও কি গোড়ায় জান্‌তো যে, সে এতবড় একটা লোক, আর তার মত পৃথিবী শুদ্ধ লোক সাদরে গ্রহণ ক'র্‌বে?

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সহসা দীপ-শলাকা প্রজ্জ্বলিত হইলে এক মুহূর্ত্তে স্থানটা যেমন আলোকময় হইয়া উঠে, বিরাজের আশ্বাস-বাক্যে ব্রজনাথের নৈরাশ্য-বিমলিন মুখখানাও তেমনই মুহূর্ত্তে আশার আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া আশা-প্রফুল্লনেত্রে বিরাজের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল। বিরাজ বলিল, "এখন লো-

তোমাকে উপহাস কর্‌লেও এক সময়ে হয় তো তুমি গ্যালিলিওর মতই সম্মান পাবে।

হাস্যভরা-কণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, "তোমার এই ভবিষ্যৎ-বাণী আমার পক্ষে খুব আশার কথা হ'লেও এ আশা কখন সফল হবে কি না সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে রাজু।"

বিরাজ লজ্জার মৃদু হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ব্রজনাথ বলিল, "সন্দেহ থাক্‌লেও আমি কিন্তু তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে আর একবার চেষ্টা না দেখে ছাড়্‌বো না।"

গম্ভীর-মুখে বিরাজ বলিল, "মেয়ে-মানুষের কথার উপর নির্ভর ক'রে কোন কাজ ক'র্ত্তে নাই। তোমার নিজের ইচ্ছা হয় চেষ্টা দেখ্‌তে পার।"

"বেশ, তাই ক'র্‌বো" বলিয়া ব্রজনাথ বিরাজের মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বিরাজ বলিল, "সে সব পরের কথা, এখন বিয়েটা তা' হ'লে নিজ্জস্ ক'চ্চো।"

সহাস্য-মুখে ব্রজনাথ উত্তর করিল, "কাজেই ক'র্ত্তে হ'চ্চে। বিয়ে না কর্‌লে তো আইবুড় নাম খণ্ডাবে না।"

বিরা। এতদিন তো সে নাম খণ্ডালে পার্‌তে।

ব্রজ। বিয়ের ফুল না ফুটলে তো খণ্ডন ক'র্ত্তে পারি না।

বিরা। এবার বোধ হয়, ফুলটা ফুটে উঠেছে?

ব্রজ। কোটো কোটো হ'য়েছে বটে, তবে যতক্ষণ না সাতপাক ফিরে যায়, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই।

বিরা। অবিশ্বাসও এমন কিছু নাই। সাতপাকের দু'বার পাক তো হ'য়ে গিয়েছে।

ব্রজ। সেগুলা শুধু পাক নয় রাজু—দুর্ব্বিপাক।

ব্রজনাথের মুখমণ্ডলে বেদনার গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেটাকে

ঢাকিবার জন্ত ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "যাক্, এখন জ্যেঠাই-মা কেমন আছেন বল দেখি?"

বিরাজ বলিল, "সেই রকমই। রাত্রে বোধ হয় জ্বর একটু হ'য়েছিল।"

ব্রজ। ওষুধ খেয়েছিলেন?

বিরা। অনেক সাধ্যসাধনার পরে একদাগ ওষুধ খেয়েছিল।

ব্রজ। মোটে একদাগ?

বিরা। তাই কত বুঝিয়ে পড়িয়ে খাইয়েছি। আমি তো আর পারি না বেজো দা, একে সংসারের এই অবস্থা, তার ওপর নিত্যি অসুখ-বিসুখ। আমার এমন ইচ্ছে হয়—"

ব্রজ। যে গলায় দড়ি দিয়ে মরি, কি যে দিকে দু'চোখ যায় চ'লে যাই, কেমন না?

ব্রজনাথ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। বিরাজ ভারী-মুখে অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিল, "তুমি হাস্‌চো বেজো-দা! আমার কিন্তু ডাকছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা করে।"

ব্রজনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা' মাঝে মাঝে একবার কাঁদলেই তো পার। এমন সাধু ইচ্ছাটাকে চেপে রাখ্‌তে কেউ তো বলে নি।"

তাহার মুখের উপর অভিমান-সজল দৃষ্টিটা একবার নিক্ষেপ করিয়াই বিরাজ বেগে ঘাড় ফিরাইয়া লইল। ব্রজনাথ বলিল, "তা' আমি চ'লে গেলে প্রাণভরে একটু কেঁদে নিও। এখন চল, জ্যেঠাই-মাকে একবার দেখে আসি।

ব্রজনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বিরাজের অপেক্ষা না করিয়াই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বিরাজ খুঁটী ধরিয়া নিস্পন্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

ননী বাহির হইতে ছুটিয়া তাহার সম্মুখে আসিল, এবং ঘাড় দোলাইয়া এবং নাকিসুরে বলিল, "ক্ষিদে পেয়েচে দিদি।"

উত্তরে বিরাজ এমন তীব্র ভ্রূকুটী করিল যে, তদ্দর্শনে ননী ভীত হইয়া পড়িল; সে আর কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু ভীতিচকিত কাতর দৃষ্টিটা দিদির মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই ব্রজনাথ বাহিরে আসিয়া বিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এখন জ্বর নাই। আমি ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি। বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন, একটু দুধ খেতে দিও।"

বিরাজ মুখ না ফিরাইয়াই গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "আচ্ছা।"

ব্রজনাথ চলিয়া গেল। দিদির ভাবভঙ্গী দেখিয়া ননী এতটা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ক্ষুধার তাড়না প্রবল হইলেও সে তাড়নার কথা দিদির কাছে ব্যক্ত করিতে সাহসী হইল না; ব্রজনাথের পশ্চাৎ সেও বিমর্ষমুখে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিরাজ ডাকিল, "ননে!"

ননী ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাস্?"

শঙ্কিতকণ্ঠে ননী উত্তর দিল, "খেল্‌তে।"

"আচ্ছা, যা।"

ননী নতমুখে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বিরাজ আরও শক্ত করিয়া খুঁটাটাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন একটু আল্‌গা পাইলেই কেহ তাহাকে ঠেলিয়া অভাবের গভীরতম কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। তাই সে দৃঢ়ভাবে খুঁটাটা জড়াইয়া আজ যেন সেই পতন হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত হইল।

কাল কোন রকমে চলিয়া গিয়াছে, আজ আর হাতে একটাও পয়সা নাই, হাঁড়ীতে যে একমুঠা চাউল পড়িয়াছিল, তাহা বাড়িয়া কাল রাত্রে ছেলে দুইটাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; ফেনে-ভাতে তাহারা কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন উপায়ই নাই। ঘরে তৈজস-পত্রও তেমন কিছু নাই, যাহা বাঁধা দিয়া বা বেচিয়া

দুই গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাইতে পারে। পিতলের ঘটী গেলাস দুইটা, পুরাতন থালা দুইখানা,—তাহা রাখিয়া কে পয়সা দিবে? বড় পিতলের কলসীটা পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে। আসনখানা বোনা শেষ হইলে আট গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেকও বোনা হয় নাই। কাল একাদশী গিয়াছে, মায়ে-ঝিয়ে মুখে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত দেয় নাই; আজ বেলা এক প্রহর অতীত হইতে চলিল, এখনও পেটে এক ফোঁটা জল পড়িল না। নিজের পেট চুলোয় যাক্, মায়ের মুখে তো একটু কিছু না দিলে চলে না। বেজো-দা বলিয়া গেল, মাকে একটু দুধ খাওয়াইতে হইবে। হা কপাল, দুধ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু দুধ একটু না দিলেও তো মা বাঁচিবে না! ঐ তো অস্থি-চর্ম্মসার দেহ—তাহার উপর জ্বর, উপবাস, উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই; এ অবস্থায় অন্ততঃ এক পোয়া দুধ না দিলেই নয়। তার পর ছেলে দুইটা—বড়টার যাহা হয় হইবে, কিন্তু ছোটটা তো এইমাত্র আসিয়া ক্ষুধার তাড়না জানাইয়া গেল; এবার ঘুরিয়া আসিলে কিছু না পাইলে তো শান্ত হইবে না! কিন্তু কি দিয়া তাহাকে শান্ত করিবে? ওঃ, ভগবান্!

বিরাজ আর ভাবিতে পারিল না, ভাবিতে গেলে তাহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে খুঁটীটা জড়াইয়া ধরিয়া খুঁটীর গায়ে মাথাটা রাখিল। দিবসের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মিকে ম্লান করিয়া দৈন্যের নিবিড় অন্ধকার তাহার দৃষ্টি-শক্তিকে রুদ্ধ করিয়া দিল; অভাবের সহস্র বিভীষিকা বিকট-মূর্ত্তিতে তাহার চারিদিকে নাচিয়া উঠিল। বিরাজ আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, ভয়ে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের ভিতর হইতে মা ডাকিলেন, "রাজি!"

বিরাজ যেন চমকিয়া উঠিল। দুই তিনবার ডাকের পর বিরক্তভাবে উত্তর দিল, "কেন?"

"বেলা কতখানি হ'য়েছে?"

"অনেকখানি।"

"কি কচ্চিস্ তুই?"

"ফলার।"

"একাই সব খাচ্চিস্?"

"তুমিও এস না, খাবে।"

কল্যাণী উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন এবং দরজা পার হইয়াই অবসন্নভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এত রেগেছিস্ কেন?"

মুখ না ফিরাইয়াই ঝঙ্কার দিয়া বিরাজ উত্তর করিল, "রাগুতে আমার সাধ হ'য়েছে।"

"ধন্যি মেয়ে যা' হোক্" বলিয়া কল্যাণী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। বিরাজ যেমন গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতখানি বেলা হ'য়েছে, এখনো দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্ যে?"

গম্ভীরভাবেই বিরাজ উত্তর করিল, "কি ক'রবো?"

রুদ্ধ-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "আমার ছাদ্দ ক'রবি।"

তীব্রস্বরে বিরাজ বলিল, "তুমি বেঁচে থাক্‌তে কি ক'রে তোমার ছাদ্দ ক'র্‌বো বল।"

ম্লান হাসি হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তা' যদি তোরা বলিস্, তা' হ'লে না হয় মরি।"

বিরাজ তীরবেগে মায়ের দিকে মুখটা ফিরাইয়া উগ্রকণ্ঠে বলিল, "ম'র্‌বে? তোমার কি মরণ আছে মা?"

গভীর আক্ষেপের স্বরে কল্যাণী বলিলেন, "সেটা বড় মিছে কথা নয় রাজি, মরণ আমার নাই; থাক্‌লে এত কষ্ট স'য়েও মহাপ্রাণী বেরোয় না কেন? যম আমায় ভুলে গিয়েছে রাজি, একেবারেই ভুলে গিয়েছে।"

শোকে দুঃখে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। একটু থামিয়া একটা দম্ লইয়া কল্যাণী কন্যার রোষ-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত-কণ্ঠে বলিলেন, "তা' আমি ম'লে কি তোরা বাঁচিস্ রাজি?"

ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে বিরাজ বলিল, "হাঁ মা, আমরা বাঁচি, সত্যিই বাঁচি। তবু একটা ভাবনা—একটা পেটের খোরাক্ ক'মে যায়।"

হায় দৈন্য, তোমার প্রভাবে সন্তানও মাতার মৃত্যু-কামনা করে! মা, মেয়ের দুঃখ বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাহার রাগে একটুও ব্যথা অনুভব না করিয়া স্নিগ্ধ-শান্তস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ রে পাগলী-মেয়ে, মায়ের চেয়ে কি পেটের খোরাক্ বড়?"

রাগে যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিরাজ কঠিন-স্বরে বলিল, "হাঁ, বড়, খুব বড়। এই আমি বড় গলা ক'রে ব'ল্‌ছি মা, তোমার মত দু'শো মা গেলে আমার ক্ষতি নাই, যদি তার বদলে দু'মুঠো ভাত নলে ছোঁড়ায় মুখে—"

বিরাজ আর বলিতে পারিল না, পুঞ্জীভূত অশ্রু আসিয়া গলার কাছে জমাট বাঁধিয়া বসিল; সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অপলক-দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্নেহ-সজল-কণ্ঠে কল্যাণী ডাকিলেন, "রাজি !"

বিরাজ আর পারিল না ; দুই চোখ ফাটিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিরাজ সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কল্যাণী সরিয়া আসিয়া আস্তে আস্তে মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

একটু পরে বিরাজ কতকটা শান্ত হইল, আঁচলে চোখ মুখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল। কল্যাণী বলিলেন, "কাল একাদশী গিয়েছে, দেহ জ্ব'লে পুড়ে র'য়েছে। একটা ডুব দিয়ে আয় না, তবু শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।"

উদাস-স্বরে "যাই" বলিয়া বিরাজ বসিয়া রহিল। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোর কি হ'য়েছে বল্ দেখি ?"

মুখ মচ্‌কাইয়া বিরাজ বলিল, "কি হবে আবার।"

উপেক্ষার সহিত কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও চিন্তা-বিশীর্ণ-মুখের ভাবটা কিন্তু গোপন করিতে পারিল না। কল্যাণী তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে চাল-টাল আছে ?"

মুখে খুব একটা বিরক্তির ভাব আনিয়া জোরে ঘাড় নাড়িয়া বিরাজ বলিল, "আছে গো আছে ? আচ্ছা, তোমার জ্বর হ'য়েছে, তুমি বিছানায় প'ড়ে থাক না ; ঘরে কি আছে না আছে, এত খোঁজে তোমার দরকার কি বল তো ?"

মেয়ের রাগ দেখিয়া কল্যাণী আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। বিরাজও নীরবে রৌদ্র-তপ্ত উঠানের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় "দিদি, দিদি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ননী বাড়ী ঢুকিতেই বিরাজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গামছাখানা টানিয়া লইয়া খুব ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া বিরাজ খুব দ্রুতপদেই স্নানের ঘাটের দিকে চলিল। কিন্তু কয়েক পদ গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। স্নান করিতে তো যাইতেছে; তার পরে? বিরাজের বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। মা কাল হইতে অভুক্ত; তাহার উপর ক্ষুধার্ত্ত ভাই দুইটা আছে। অন্ততঃ সেরখানেক চাল—দু'চার গণ্ডা পয়সা—কোথাও কি ধার পাওয়া যায় না? কে ধার দিবে? যাহার শোধ দিবার উপায় নাই, সে-ই বা কোন্ মুখে ধার করিতে যাইবে? যদিই বা কেহ ধার দেয়, তবে তাহা ধার বলিয়া দিবে না, ভিক্ষা বলিয়াই দিবে। আচ্ছা, ভিক্ষা—না খাইতে পাইলে লোকে ভিক্ষা করিয়া খায়; সেও কি ভিক্ষা করিয়া মাকে—ভাই দু'টাকে খাওয়াইতে পারে না! সে ভিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু 'ভিক্ষা দাও' কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করাই যে দুষ্কর। না না, সে কথাটা প্রাণ গেলেও উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

আচ্ছা, এই দুপুরের রোদে পুকুরের ঐ ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়া মরিলে ক্ষতি কি? কেমন স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সলিলরাশি! মৃদু বায়ুহিল্লোলে কেমন ছোট ছোট ঢেউগুলি নাচিয়া বেড়াইতেছে! ঐ ঢেউগুলির নীচে—ঐ সুশীতল স্বচ্ছ-সলিলরাশির মধ্যে এই জ্বালাময় প্রাণটা লইয়া অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে কি ভাল হয় না? আহা, কি স্নিগ্ধ স্বচ্ছন্দ বিশ্রাম! বিরাজের লুব্ধ দৃষ্টিটা অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণীর তরঙ্গায়িত কৃষ্ণ-জলরাশির দিকে নিক্ষিপ্ত হইল; বুকের ভিতর একটা আকুল-বাসনা ঘন ঘন উঠিতে পড়িতে লাগিল। কিন্তু হায়, মরণেই বা তাহার অধিকার কোথায়? সে মরিলে মায়ের কি হইবে? ভাই দুইটা কোথায় দাঁড়াইবে? বিরাজ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া ভয়ে ভয়ে দুই পা পিছাইয়া দাঁড়াইল।

আচ্ছা, বেজো-দা'র কাছে গেলে ক্ষতি কি? ক্ষতি কিছুই নাই, তবে—দূর হউক অভিমান, দূর হউক লজ্জা! পরের বাসয় হওয়া অপেক্ষা

বেজো-দার কাছে মাথা হেঁট্ করা কি এতই অপমানজনক ! বেজো-দা কি পর হইতেও পর ? একটুও পর নয়, খুব আপন সে, তাহার মত আত্মীয় জগতে বিরাজের আর একজনও নাই।

বিরাজ আর ভাবিল না, দাঁড়াইল না ; পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে ব্রজনাথের বাড়ীর দিকে চলিল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ আহারে বসিয়াছিল। আমোদিনী তাহার সম্মুখে বসিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ্ বেজো, তুই মনে করিস্ আমি নেহাৎ মেয়ে-মানুষ, পাঁচ কথায় আমাকে ভুলিয়ে দিবি। কিন্তু এটা তোর মস্ত ভুল ধারণা। লেখাপড়া শিখ্লেও, হাজার বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ হ'লেও আমি তোর মা ; গর্ভধারিণী মা না হ'লেও সৎ-মা তো বটে।"

ব্রজনাথ নীরবে মৃদু হাস্য করিল। আমোদিনী বলিলেন, "আমি কিন্তু তোর কথায় আর ভুলছি না বাছা, ও-সব গরীব বড়লোক, দায় অদায় কিন্তু আমি শুন্বো না। নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রেছি, এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দেব।"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "বেশ।"

আমোদিনী বলিলেন, "বেশ নয়, বল্, তোর মত কি ?"

ভোজনপাত্র হইতে মুখ তুলিয়া ব্রজনাথ উত্তর করিল, "আমার মতামত জিজ্ঞাসা ক'চ্চো কেন ? তুমি তো নিজের মতেই কাজ ক'র্বে।"

সগর্ব্ব শিরঃসঞ্চালনসহকারে আমোদিনী বলিলেন, "তা তো ক'র্বোই,

আমি কি তোর মতের অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বো ? তবে তোকে একবার বলা দরকার তাই বল্‌ছি।"

ব্রজনাথ পুনরায় আহারে মনঃসংযোগ করিল। আমোদিনী আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সংসারে তাঁহার সুখ-শান্তির আর আছে কি ? এখন ব্রজনাথের সুখই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ব্রজনাথের বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী দেখিলেই তিনি সুখ ও শান্তি উভয়ই লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে পরলোকের চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। শুনিতে শুনিতে ব্রজনাথ মুখ তুলিয়া ডাকিল, "আচ্ছা নতুন-মা !"

"কি ব'ল্‌ছিস্ ?"

"ব'ল্‌ছি, এ পর্য্যন্ত যতগুলি লোক বিবাহ ক'রেছে, তাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যে বল্‌তে পারে বিয়ে ক'রে আমি সুখী হ'য়েছি। সকলেই তো ব'লে থাকে, বিয়ে ক'রে তারা যত অসুখী হ'য়েছে, এমন অসুখী বিয়ের আগে একদিনের তরেও হয় নি।"

মুখ মচ্‌কাইয়া আমোদিনী বলিলেন, "ও অমন লোকে ব'লে থাকে।"

ব্রজনাথ বলিল, "শুধু ব'লে থাকে কেন, দেখ্‌তেও তো পাচ্ছি, বিয়ে ক'র্‌লে একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট্‌ এসে জড়িয়ে ধরে।"

ভারী-মুখে আমোদিনী বলিলেন, "সেই ঝঞ্ঝাটের ভয়েই তুই বুঝি বিয়ে ক'র্‌ত্তে চাস্‌ না ?"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "সেটা বড় মিছে নয় নতুন-মা। কে সাধ ক'রে দুঃখ কষ্টকে জড়িয়ে ধ'র্‌তে চায় ?"

চিন্তা-গম্ভীর-মুখে আমোদিনী বলিলেন, "তা' হ'লে তুই বিয়ে ক'র্‌বি না, এই তোর মন্তব্য বল্‌ ?"

ব্রজনাথ বলিল, "আমার মন্তব্য ঠিক তাই ; কেন না, বিয়ে না ক'রে আমি তো দিব্যি আছি। কিন্তু তুমি—"

অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে আমোদিনী বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোর সৎ-মা কি না; তাই আমি সতীন-পোর সুখটুকু নষ্ট ক'র্‌বার তরে উঠে প'ড়ে লেগেছি।"

অভিমানে আমোদিনীর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। ব্রজনাথ অপ্রতিভ-ভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দোহাই নতুন-মা, তুমি আমার সুখের হন্তারক হও না হও, সৎ-মা ব'লে আমি কিন্তু তোমার সুখের হন্তারক হ'য়েছি, এটা আমাকে স্বীকার ক'র্তেই হবে। নইলে সতীন-পোর বিয়ে দিয়ে তুমি একটু সুখী হবে—সে সুখটুকুতেও তোমাকে বঞ্চিত ক'র্‌বো কেন?"

ব্রজনাথের কথায় আমোদিনীর অভিমান দূরীভূত হইল। তিনি স্নেহ-সজলনেত্রে সহাস্য-মুখে বলিলেন, "সুখে বঞ্চিত তুই আমাকে করিস্ নাই বেজো, অনেকদিন আগে আমিই তোর সুখের মূলটুকু উপ্‌ড়ে দিয়েছি। কিন্তু তুই ছেলে—তোর গা ছুঁয়ে ব'ল্‌তে পারি, তখন আমি জান্‌তাম না, সে আঘাত তোর কোথায় গিয়ে লাগ্‌বে। এখন শুধু তোর মুখের দিকে নয়—বিরাজের মুখের দিকে চাইলেও আমার বুকটা যেন ফেটে যায়। মনে হয়, ভগবান্, তেমন দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে কেন দিয়েছিলে?"

তাঁহার মুখের হাসিটুকুর মধ্যে যেন অনুতাপের একটা তীব্র যাতনা ফুটিয়া উঠিল। ব্রজনাথ নিঃশব্দে একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। অনুতাপ-ভগ্নকণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "এখন শুধু তোর সুখের জন্য আমার চেষ্টা নয় বেজো, এই যে আমি তোর বিয়ের তরে এত চেষ্টা ক'চ্চি; এ চেষ্টা সেই পুরাণো পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত।"

উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে ব্রজনাথ বলিল, "বেশ, তোমার এই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হোক্ নতুন-মা!"

এই স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তির উত্তরে আমোদিনী কি বলিতে যাইতে-

ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বলা হইল না; ঠিক দম্‌কা ঝড়ের মত বিরাজ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল, এবং ভয়-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি আজ তোমার দরজায় ভিক্ষা চাইতে এসেছি বেজো-দা, ভিক্ষা দিয়ে আমার মা ভাইদের রক্ষা কর।"

সহসা বজ্রপতন শব্দ শুনিলেও ব্রজনাথ ততটা স্তম্ভিত হইত না, বিরাজের মুখে ভিক্ষার কথা শুনিয়া যতটা স্তম্ভিত হইল। সে হতবুদ্ধির ন্যায় বিরাজের উত্তেজনা-রক্তমুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিরাজ জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "তুমি হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কি বেজো-দা, রোগে পথ্য না পেয়ে মা মরে, পেটের জ্বালায় ভাই দু'টো মারা যায়। তাই লজ্জা-সম্ভ্রম সব ত্যাগ ক'রে এই ঠিক দুপুর-বেলা তোমার দরজায় ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

আমোদিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত দুইটা ধরিলেন; শান্ত মধুরস্বরে বলিলেন, "বেশ ক'রেছিস্ বিরাজ, তোর বেজো-দার দরজায় এসে খুব ভাল কাজই ক'রেছিস্। কিন্তু ভিক্ষা কি মা, বেজোর ঘর আর তোর ঘর কি ভিন্ন? এ-ঘরের সকল জিনিষেই যে তোর স্থায়ী অধিকার আছে মা! আমিই তো না বুঝে সে অধিকার হ'তে তোকে বঞ্চিত ক'রেছি।"

বিরাজ তাঁহার পায়ের কাছে মুখটা গুঁজিয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্রজনাথ উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিতে আমোদিনী ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে বেজো, সেদিন তুই বিধবা-বিবাহের কথা বল্‌ছিলি। তা বিধবার বিয়ে কি সত্যি হয়?"

ব্রজনাথ বলিল, "শাস্ত্রের বিধানে হয়, কিন্তু সমাজের বিধানে হয় না।"

আমোদিনী নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সহাস্যে ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বিধবার বিয়ে দেবে নাকি নতুন-মা?"

আমোদিনী বলিলেন, "মেয়েটার কষ্ট দেখে তাই মনে হয় বেজো।"

ব্রজ। কোন্ মেয়েটা! রাজু বুঝি?"

আমো। হাঁ, ওর কথাই ব'ল্‌ছি।

ব্রজনাথের মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে সম্বন্ধের কথা ব'ল্‌ছিলে, সেটা ঠিক হ'য়ে গিয়েছে?"

আমোদিনী বলিলেন, "দেখাশোনা কথাবার্ত্তাই হ'য়ে আছে, স্থির কিছু হয় নি।"

ব্রজনাথ বলিল, "শীগ্‌গির স্থির ক'রে ফেল, এই মাসের মধ্যেই কাজ শেষ ক'র্ত্তে হবে।"

বিবাহের উপর তাহার এই আগ্রহ দর্শনে আমোদিনী চমৎকৃত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হাটপুকুরের ভাঙ্গা-ঘাটের চাতালে বুড়া আমগাছটার ছায়ায় বসিয়া হরি খুড়ো গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

মা গো তারা ও শঙ্করি!
তুমি কোন্ বিচারে আমার উপর
করে দুঃখের ডিক্রীজারী।"

তপ্ত-বাতাস কানের পাশ দিয়া শন্ শন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল।

আমগাছের মাথায় বসিয়া একটা পাখী ফটিক্-জল ফটিক্-জল বলিয়া চীৎকার করিতেছিল; দীপ্ত সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে পুকুরের জলটা চক্ চক্ করিতেছিল। হরি খুড়ো কোন দিকে না চাহিয়াই আপন মনে গাহিতে-ছিল—'মা গো তারা ও শঙ্করি!'

"হরি-খুড়ো!"

হরি-খুড়ো চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "কে, বিরাজ-খুড়ী! কোথায় গিয়েছিলে মা?"

"বেজো-দার বাড়ী।"

"বেজো খুড়োর বাড়ী! বেশ বেশ, মিনিও ঐ রকম এক এক দিন দুপুর বেলা আমার বাড়ীতে আসে। তাতে কত লোকে কত কথা বলে। তা বলুক; মিনি যে আমার কে, সে কথা তো তারা জানে না; কাজেই তারা মুখে যা আসে তাই ব'লে যায়।"

বিরাজের বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। হরি খুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাপড়ে ও-সব কি?"

কক্ষস্থিত পুঁটুলীর দিকে ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরাজ উত্তর করিল, "চাল, ডাল, পয়সা।"

"বেজো-খুড়ো দিয়েছে বুঝি? মিনিকেও মাঝে মাঝে আমি চালটা ডালটা দিই। পয়সা দিতে পারি না, কোথায় পাব! বেজো-খুড়োর অনেক পয়সা আছে, সে দিতে পারে।"

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিরাজের সর্ব্বশরীর মুহূর্ত্তের জন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে লজ্জাজড়িত-কণ্ঠে বলিল, "এক কাজ ক'র্ত্তে পারবে হরি-খুড়ো?"

সহাস্তে হরি-খুড়ো বলিল, "কাজ ক'র্ত্তে কেন পারবো না! ছেলে-বেলা থেকে কাজই তো ক'রে আসছি। কি কাজ ক'র্ত্তে হবে বল।"

বিরাজ বলিল, "রাস্তায় কেউ কোথাও নাই, বড্ড ভয় করে। আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে ?"

হরি-খুড়ো বসিয়াছিল, তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িল ; বলিল, "খুব পার্‌বো—চল।"

বিরাজ অগ্রসর হইল, হরি-খুড়ো তাহার পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে সে মিনির সম্বন্ধে কত কথাই বলিল। মিনিকে সে কত ভালবাসে, নিজে না খাইয়াও মিনিকে খাওয়ায়, লোকে কত কথা বলে, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করে না, ইত্যাদি কখন দুঃখ কখন বা হাস্য-সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিল। বলিতে বলিতে হঠাৎ সে একটু থামিল ; তার পর বিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ, দেখ বিরাজ-খুড়ী, বেজো-খুড়ো কি বলে জান, 'হরি-খুড়ো, তুমি মিনিকে বিয়ে কর।' তা' আমি বলি, তার যে বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, সে বিধবা। বেজো-খুড়ো বলে, বিধবাকে বিয়ে করা চলে, সে নিজেও বিধবা বিয়ে ক'র্‌বে।"

বিরাজ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; হরি-খুড়োর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা বিয়ে ক'র্‌বে ? কে ব'ল্‌লে ?"

মাথা নাড়িয়া হরি-খুড়ো বলিল, "সে নিজে গো নিজে। বলে, শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে লেখা আছে। তা' কে জানে বাবু, বামুনের ছেলেই হ'য়েছি, শাস্ত্র-টাস্ত্র তো কিছু পড়ি না।"

বিরাজের মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ বিধবা-বিবাহ করিবে ? কে সে বিধবা ? তাই কি সে একদিন বিরাজকে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ? বিরাজের চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল।

তাহাকে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হরি-খুড়ো বলিল, "রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? চল না ?"

ধরা-গলায় বিরাজ বলিল, "রোদে মাথাটা জ্বালা ক'চ্চে? মাথায় একটু জল দিই।"

রাস্তার ঠিক পাশেই একটা ছোট পুকুর ছিল। বিরাজ ধীরে ধীরে সেই পুকুরে গিয়া নামিল। হরি-খুড়ো সরিয়া আসিয়া একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াইল।

জলে নামিয়া বিরাজ প্রথমে চোখে মুখে মাথায় জল দিল। তার পর কক্ষের পুটুলীটা বাহির করিয়া তাহা খুলিবার উপক্রম করিল। হরি-খুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, "পুটুলী খুল্‌চো কেন খুড়ী?"

বিরাজ বলিল, "একমুঠো চাল খেয়ে জল খাব।"

বলিতে বলিতে বিরাজ পুটুলীর গেরো খুলিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে চাল ডাল গুলা ঝর্ ঝর্ করিয়া জলে পড়িয়া গেল। হরি-খুড়ো ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তখন কাপড়ে আর একটীও চাল নাই। সে আক্ষেপ-সহকারে বলিয়া উঠিল, "ধাঃ, সব জলে ফেলে দিলে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া বিরাজ বলিল, "কি ক'র্‌বো, প'ড়ে গেল যে।"

ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে হরি-খুড়ো বলিল, "প'ড়ে গেল, না ইচ্ছা ক'রে ফেলে দিলে? আহা হা, এক রাশ চাল!"

কাপড়খানা ঝাড়িয়া লইয়া বিরাজ উপরে উঠিল; মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল, "যাক্, উঠে চল।"

জলতলস্থ চাউলগুলার দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরি-খুড়ো বলিল, "যাব তো, কিন্তু চালগুলো—"

বিরাজ বলিল, "ও চাল নয়—বিষ। তুমি উঠে এস।"

ক্ষুণ্ণ-মনে উপরে উঠিয়া হরি-খুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কথা বল খুড়ী, ঘরে চাল আছে?"

সহাস্যে বিরাজ বলিল, "একটী ক্ষুদও নাই।"

"তবে খাবে কি ?"

"একদিন না খেলে কি চলে না ?"

"তা' চলে। এই যে আমার এক এক দিন উপোসে কেটে যায়।"

বিরাজ বলিল, "তোমার কাটে, আর আমার কাটবে না ?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক হরি-খুড়ো বলিল, "যদি তা' কাটতো খুড়ী, তা' হ'লে কক্ষণো তুমি বেজো-খুড়োর বাড়ী যেতে না। যেতে কি ?"

এ প্রশ্নের উত্তর বিরাজ দিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরি-খুড়ো বলিল, "তুমি যাও খুড়ী, আমি আমার ঘরে যাই।"

হরি-খুড়ো ফিরিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিল ; যাইতে যাইতে গান ধরিল—

"মা গো তারা ও শঙ্করি !"

বিরাজ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর হরি-খুড়ো অদৃশ্য হইলে সে ভগ্ন-কম্পিত-পদে বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

"দিদি, তুমি কোথায় ছিলে দিদি ?"

বাড়ী ঢুকিতে যাইতেই ননী আসিয়া বিরাজকে জড়াইয়া ধরিল। কাঁদ-কাঁদ-মুখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড্ড কিদে পেয়েছে দিদি। মা বল্লে, তোর দিদি খাবার আনতে গিয়েছে। কি খাবার এনেছ দিদি ? খাবার দাও।"

খাবার পাইবার আশায় ননী হাত পাতিল। তাহার এই সকাতর

প্রার্থনার উত্তরে বিরাজ কি বলিবে, কি বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত বালককে শান্ত করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া আকুল হইয়া পড়িল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ননী তাহার ভিজা কাপড় টানিতে টানিতে সরোদনে বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে দিদি, খাবার দাও।"

বিরাজ নিরুপায়ভাবে একবার এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করিল; তারপর ধরা-গলায় বালককে ধমক দিয়া বলিল, "কাপড় ছাড়্, খাবার কি রাস্তায় প'ড়ে আছে?"

ধমক খাইয়া ননী কাপড় ছাড়িয়া দিলে বিরাজ দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

কল্যাণী দাওয়ার উপর দেওয়াল ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন। বিরাজকে দেখিয়া তিনি একটী কথাও বলিলেন না; শুধু তাহার দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিরাজও কিছু না বলিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল।

কাপড় ছাড়িয়া, ভিজা কাপড়খানা শুকাইতে দিয়া বিরাজ দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলে কল্যাণী ক্রোধগম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "রাজি!"

বিরাজও গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কেন?"

কল্যা। এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

বিরা। চুলোয়।

ভ্রূকুটি করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "ভাল জায়গাতেই তো গিয়েছিলি, তা' ফিরে এলি যে আবার?"

তীব্র-কণ্ঠে বিরাজ বলিল, "না এলে তোমার শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে কে?"

বিকৃত-মুখে কল্যাণী বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ যা' ক'র্‌বার তা' তো ক'রেছ। নাইতে গিয়েছিলে কি আজ? পুকুরে কি জল ছিল না?"

বিরাজ বলিল, "জল থাক্‌লে কি ফিরে আসি?"

রাগে চীৎকার করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "পরণে তো কাপড় ছিল, পুকুরের পাড়ে তো গাছ ছিল। দড়ি না জুটতো, গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে মলি না কেন?"

মুখ মচ্‌কাইয়া যেন তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বিরাজ বলিল, "অমন সৎ-যুক্তিটা মনে এলো না ব'লে?"

গর্জ্জন করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "মুখে আগুন? জবাব দিতে একটু লজ্জা হ'চ্চে না?"

বিরাজ বলিল, "লজ্জা থাক্‌লে তো? হাতের শাঁখা-লোহার সঙ্গে লজ্জাটাও যদি পুড়ে ছাই না হ'তো, তা' হ'লে কি আজ একমুঠো পেটের ভাতের তরে ঠায় দাঁড়িয়ে মায়ের মুখে এই সব কথা—"

অভিমানের উচ্ছ্বাসে বিরাজের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চোখের জল না ফেলিলেও সে জলভরা চোখ দুইটাকে মাতার দিক্ হইতে ফিরাইয়া লইল। সে চোখের জল লুকাইবার চেষ্টা করিলেও মায়ের কাছে কিন্তু তাহা গোপন রহিল না; তাহার বাষ্পরুদ্ধ স্বরটা কল্যাণীর ক্রোধোত্তেজিত চিত্তে এমন একটা আঘাত দিল যে, সে আঘাতটা ক্রোধের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া স্নেহের দরজায় গিয়া ঘা মারিল। কাজেই মাতার রোষ-কঠোর স্বরটা অপেক্ষাকৃত স্নেহ-কোমল হইয়া আসিল। তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদ-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "তোর যেমন কপাল! আর এমন মন্দ কথাই বা কি আমি বলেছি। তুই নাইতে গিয়েছিলি কখে, আর ফিরে এলি কখন্। লোকে শুন্‌লে আমার মুখটা যে পুড়িয়ে দেবে।"

ভারী-গলায় বিরাজ বলিল, "মুখ তো সবাই পুড়িয়ে দেয়, কিন্তু এই যে কাল থেকে উপোস্, আজ এতখানি বেলা হ'লো, কৈ, এক ফোঁটা জলও তো কেউ মুখে দিতে আসে নি।"

গম্ভীরভাবে কল্যাণী বলিলেন, "তাই বুঝি তুই তিন ঘণ্টা ধ'রে আমার মুখে জল দেবার যোগাড় কচ্ছিলি ?"

ঝঙ্কার দিয়া বিরাজ বলিল, "আমি কোথা থেকে কি যোগাড় ক'র্‌বো বল তো ? আমি কি তোমাদের তরে ভিক্ষা ক'ত্তে যাব ?"

বিষাদ-করুণ-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "ভিক্ষারই আর বাকী কি আছে রাজি ? হরিবোল ব'লে ভিক্ষা ক'র্‌লেই কি ভিক্ষা হ'লো।"

রোষরক্তমুখে বিরাজ বলিল, "কার কাছে কি ভিক্ষা ক'রেছি বল তো ? ঘটী বেচি, বাটী বেচি, সে আলাদা কথা, কিন্তু ভিক্ষা ব'লে কবে কার কাছে হাত পেতেছি ?"

কল্যাণী বলিলেন, "পাকে-প্রকারে হাত পাতা হ'য়েছে বৈকি। এই যে কত লোকের চাল ধারি, টাকা পয়সা ধারি। আমরাও তাদের দিতে পারি না, দিতে পার্‌বো না ব'লে তারাও আমাদের চায় না। তারা সেগুলো আমাদের ভিক্ষা দিয়েছে ব'লেই মনে ক'রে র'য়েছে।"

মুখ খিঁচাইয়া বিরাজ বলিল, "হাঁ, র'য়েছে! কে র'য়েছে বল তো ? কে কত টাকা আমাদের দিয়ে রেখেছে ?"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া তিরস্কারের স্বরে কল্যাণী বলিলেন, "সে গুমোর আর করিস্‌ না রাজি। এই তো বেজোই কত বার আমাদের কত টাকা দিয়েছে।"

গর্জ্জন করিয়া বিরাজ বলিল, "অমনি দিয়েছে! তাদের কাছে আমার এক রাশ গয়না র'য়েছে তা' জান ? যা' দিয়েছে, সেই গয়না থেকে কাটিয়ে নেব।"

বিরাজ জোর করিয়া দৈন্যটাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, বড় দুঃখেও কল্যাণীর হাসি আসিল। তিনি ম্লান হাস্য সহকারে "তাই দিস্‌" বলিয়া এই বাদানুবাদের উপসংহার করিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর হইতে

দেখিয়া বিরাজও চুপ করিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া পেয়ারা-গাছের ছায়াটা উত্তর দিক্ হইতে কতটা পূর্ব্বে সরিয়া আসিয়াছে, তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তাহারা শান্ত হইল, কিন্তু ননী শান্ত হইল না। মাতা ও কন্যার মধ্যে যতক্ষণ কথা কাটাকাটি চলিতেছিল, ততক্ষণ সে পেয়ারা-গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কোন একটা ডালে একটাও পাকা বা ডাঁসা পেয়ারা আছে কি না, মনোযোগসহকারে তাহারই অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু অন্বেষণ যখন নিষ্ফল হইল, ফুলের রাশি ছাড়া একটা কাঁচা পেয়ারার অস্তিত্বও দেখা গেল না, এ দিকে মা ও দিদি তর্কযুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল, তখন ননী পেয়ারা-গাছের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় নাই দেখিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইল এবং ক্ষুধার প্রাবল্য জ্ঞাপন করিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের এই ব্যাকুলতায় কল্যাণী অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি মিষ্ট কথায় ছেলেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, ছেলে কিন্তু দিদির আগমন প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ভুলিয়া থাকিলেও এবার আর ভুলিল না; সে মায়ের কাপড় টানিয়া, তাঁহার পিঠে মাথায় কীল চড় বসাইয়া কান্না জুড়িয়া দিল। কল্যাণীর আর সহ্য হইল না; একে রুগ্ন-শরীরে দুই দিনের উপবাস, তাহার উপর বিরাজের সহিত এতক্ষণ কথা কাটাকাটি—সর্ব্বোপরি অন্নাভাবের নিদারুণ হাহাকার; তাঁহার মাথার ভিতর ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, চোখের কাছে সব যেন অন্ধকার হইয়া আসিল; ছেলের কান্নায় উত্তেজিত হইয়া তিনি—যাহা কখনও করেন নাই—নির্ম্মম হস্তে ছেলেকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ননী চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, তথাপি প্রহারের বিরাম হইল না; ছেলেগুলা যমালয়ে গেলেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হন, ক্রোধরুদ্ধ-কণ্ঠে ইহাই ব্যক্ত করিতে করিতে যেন

সত্ত সত্ত যমালয়ে পাঠাইবার জন্ত তাহার গালে, পিঠে, মাথায়, চপেটাঘাতের উপর চপেটাঘাত দিতে লাগিলেন।

বিরাজ এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিস্পন্দ পাষাণ প্রতিমার স্তায় পাষাণী মাতার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু আর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না ; উন্মত্তা বাঘিনীর স্তায় ছুটিয়া আসিয়া মায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাঁহার হাত হইতে ননীকে ছিনাইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল। কল্যাণী যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ছেলেকে গালি দিতে লাগিলেন। বিরাজ তখন মায়ের দিকে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "রাক্ষসি, মা হ'য়ে ছেলেটাকে খুন ক'ত্তে বসেছিস্!"

উন্মাদ-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "শুধু ওকে খুন! ওকে খুন করবো, মণেকে খুন করবো, তার পর তোকে খুন ক'রে নিশ্চিন্দি হ'য়ে নিজের গলায় ছুরী দেব।"

চীৎকার করিয়া বিরাজ বলিল, "যদি তাই তোমার সাধ, তবে অমন দগ্ধে দগ্ধে খুন করে না ; খুন কেমন ক'রে ক'ত্তে হয়, এই দেখ।"

বিরাজের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিয়া দুই হাতে ননীর গলা চাপিয়া ধরিল। ননী রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি গো, দিদি গো!"

"সর্ব্বনাশী, করিস্ কি ?" বলিয়া কল্যাণী ছুটিয়া আসিলেন। ননী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি ?"

বিরাজ তাহার গলা ছাড়িয়া, তাহাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার আকুল কণ্ঠ হইতে শুধু উচ্চারিত হইল, "ভগবান্!"

ভগবানের পরিবর্ত্তে হরি-খুড়ো গামছায়-বাঁধা একটা ছোট মোট মাথায় লইয়া বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে ডাকিল, "বিরাজ-খুড়ী, ও বিরাজ-খুড়ী।"

বিরাজ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হরি-খুড়ো মাথার মোটটা ধপাস্ করিয়া দাওয়ার উপর ফেলিল, এবং মোট খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে সের কতক চাউল ও কতকগুলা মুড়কী বাতাসা বাহির করিতে করিতে বিরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "বেজো-খুড়োর চাল ডালগুলো তো পুকুরের জলে ঢেলে দিয়ে এলে। তা' আমার ঘরে ডাল নাই, এই ক'টা চাল ছিল, আর মুড়কী বাতাসাগুলো কাল বোসেদের বাড়ীতে সুবচনী পূজোয় পেয়েছিলাম। আয় রে ননী-খুড়ো, এইগুলো ভোগে লাগিয়ে দে।"

মুড়কী বাতাসা দেখিয়া ননী প্রহারের যাতনা বিস্মৃত হইল; এবং ছুটিয়া আসিয়া সেগুলার সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করিল।

বিরাজ ততক্ষণে আপনাকে সাম্‌লাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে চাউলগুলার দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিয়া গদগদকণ্ঠে ডাকিল, "হরি-খুড়ো!"

চাউলগুলা মাটীতে ঢালিয়া দিয়া হরি-খুড়ো গামছাখানা কাঁধে ফেলিল, এবং ব্যস্ততার সহিত বলিল, "আমার ব'স্‌বার সময় নাই খুড়ী, দীনে-বাগ্দীর মা বুড়ী এসে দোরে ব'সে আছে। বুড়ীর কাল থেকে খাওয়া হয় নি। যাই, ওবেলার তরে ভাত এক মুঠো রাঁধা আছে। সেই ক'টা বেড়ে দিই গে। ওবেলা পারি তো মিনিদের বাড়ীতে এক মুঠো খেয়ে আস্‌বো, নয় তো—সে যা' হ'বার হবে। দেখ্‌বো ননী-খুড়ো, মুড়কী-গুলো সাবাড় ক'ত্তে।"

হরি-খুড়ো উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল, এবং সে হাস্যের প্রতিধ্বনি বাতাসে না মিলাইতেই ঠিক বাতাসের মতই দ্রুতবেগে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

হরি-খুড়ো চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার উচ্চ হাস্যের প্রতিধ্বনি অভাবের নিদারুণ হাহাকারে-পূর্ণ বাড়ীখানার মধ্যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি বেজোদের বাড়ী থেকে চাল নিয়ে এসেছিলি রাজি?"

উদাসস্বরে বিরাজ উত্তর দিল, "হাঁ।"

কল্যাণী। নিয়ে এলি তো সেগুলো জলে ঢেলে দিয়ে এলি কেন?

বিরা। বড্ড ভারী বোধ হ'লো।

কল্যা। এমন ভার বইতে গিয়েছিলি কেন?

বিরা। বুঝ্‌তে পারি নাই।

কল্যা। আর কখন এমন নির্ব্বোধের কাজ করিস্ না।

মায়ের দিকে ফিরিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্বরে বিরাজ বলিল, "এমন কাজ তো আর কখন ক'রবোই না, তা ছাড়া এবার বেজো-দা এলে তাকে এখানে আস্‌তে বারণ ক'রে দিও।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আস্‌তে বারণ ক'রে দেব?"

দৃঢ়স্বরে "হাঁ" বলিয়া বিরাজ রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া কল্যাণী বিস্ময়াবিষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু বারণ করা হইল না। যাহাকে বারণ করিবে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যেও সে একবার বাড়ী ঢুকিল না। ইহাতে বিরাজ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। অবশ্য, সোজা দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে বিরাজের ক্ষুব্ধ হইবার কোনই কারণ ছিল না;—যাহাকে বাড়ীতে আসিতে দিতে অনিচ্ছা, সে যদি আপনা হইতেই বাড়ী না ঢুকিল, তাহা হইলে সকল গোলই তো চুকিয়া গেল; বরং একজনের মুখের উপর "তুমি এসো না" বলিয়া রূঢ়তা প্রদর্শন করিতে হইল না। কিন্তু বিরাজের ইচ্ছা সেরূপ নয়; তাহার ইচ্ছা, সে ব্রজনাথের মুখের উপর স্পষ্ট এই নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে, আর তাহা শুনিয়া ব্রজনাথ কি উত্তর দেয়, তাহার মুখের ভাবটা কিরূপ

আকার ধারণ করে, তাহাই সে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়; এজন্য সম্ভবাতিরিক্ত রূঢ়তা প্রদর্শন করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে। কিন্তু তাহার মুখে নিষেধাজ্ঞা শুনিবার আগেই ব্রজনাথ যখন সে বাটীতে যাতায়াত পরিত্যাগ করিল, তখন স্বতই বিরাজের চিত্তটা ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সে প্রত্যহ সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিত, আজ হয় তো বেজো-দা আসিবে, এবং সে আসিলে কি ভাবে তাহার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া আপনার নিষেধাজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক বেজো-দার বিধবা-বিবাহের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিবে, তাহা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিত। কিন্তু এইরূপ প্রতীক্ষায় সাত আট দিন কাটিয়া গেলেও যখন ব্রজনাথের দেখা মিলিল না, তখন ক্ষোভের পরিবর্ত্তে যেন একটা দুশ্চিন্তার উদয় হইল। যে ব্রজনাথ ইদানীং প্রায় প্রত্যহই একবার না আসিয়া থাকিতে পারে না, দৈবাৎ এক দিন না আসিলে পরদিন আসিয়া পূর্ব্বদিবসের অনুপস্থিতির জন্য যত কৈফিয়ৎ দেয়, সে আজ আট দিনের মধ্যে একবার দেখা দিল না। তবে কি সেদিন বিরাজকে তাহার দ্বারে ভিখারিণীরূপে উপস্থিত দেখিয়া সেই ঘৃণায় এখানে যাতায়াত ত্যাগ করিল। কিন্তু অভাবে পড়িয়া সে অভাবের কথা না জানাইলে সে নিজেই তো কত অনুযোগ করিয়া থাকে। সে বেশ জানে, ভিক্ষা বলিয়াই হউক বা সাহায্য বলিয়াই হউক, সে ছাড়া তাহাদিগকে এক পয়সা দিবার লোক আর কেহই নাই। সুতরাং সেদিনকার ঘটনায় তাহার রাগ বা ঘৃণা হইতেই পারে না। তবে কেন সে আসে না?

বিরাজ ক্রমেই যেন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথের না আসিবার কারণ ছিল; সে মস্ত একটা গোলযোগে পড়িয়াছিল।

ডেপুটী-বাবুর আগমনে দেশের উপকার কিছু না হউক, অপকার একটু হইল। পূর্ব্বে ব্রজনাথের উত্তেজনায় যাহারা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানে অনেকটা মনোযোগী হইয়াছিল, ডেপুটী-বাবুর আগমনের পর হইতে তাহাদের সে মনোযোগ যেন অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। দুই তিনটা পুষ্করিণী পরিষ্কৃত ও কতকগুলা জঙ্গল কর্ত্তিত হইয়াছিল; একটা 'রিজার্ভ-ট্রাঙ্ক' স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছিল। সরকারদের একটা 'মজা' পুকুর ছিল; ব্রজনাথের অনুরোধে সরকাররা তিন সরিকে একমত হইয়া সেটাকে সাধারণের ব্যবহারার্থ ছাড়িয়া দিয়াছিল। অবশ্য এজন্য তাহা-দিগকে বিশেষ কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয় নাই; পুকুরটা তাহাদের যেমন দখলে ছিল তেমনই থাকিবে, পুকুরের উৎপন্ন মৎস্যাদির উপস্বত্বও তাহারা ভোগ করিবে; তবে উহার জল যাহাতে অপবিত্র হয় এরূপ কার্য্য করিতে পারিবে না। উহার পরিষ্কৃত জল সাধারণে পানীয়রূপে ব্যবহার করিবে। এই সর্ত্তে একটা লেখাপড়াও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে লিখিত হইয়া তাহা রেজেষ্টারী করা হয় নাই; উহা রেজেষ্টারী করিবার আবশ্যকতাও বোধ হয় নাই। সাদা কাগজে লেখাপড়া করিয়া পাঁচজন ভদ্রলোককে সাক্ষী রাখিয়া ব্রজনাথ পুষ্করিণীর সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

এই কার্য্য ব্রজনাথের একার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছিল না, ইহাতে গ্রামের সকলের না হউক, অনেকেরই সাহায্য ছিল; নিম্নশ্রেণীর লোকেরা

খাটিয়া সাহায্য করিতেছিল, ভদ্রলোকেরা চাঁদা দিতেছিল বা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। এইরূপে সাধারণের সাহায্যে পুষ্করিণীর জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া পঙ্কোদ্ধার করা হইতেছিল। পাঁকও প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া গিয়াছিল। এমন সময় ডেপুটী-বাবুর আগমনে আরব্ধ-কার্য্যে বাধা পড়িয়া গেল।

অনেকেই আশা করিয়াছিল, ডেপুটী-বাবু আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, এবং গ্রামের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আরও সুব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। ব্রজনাথও তাহাদিগকে এইরূপই আশা দিয়াছিল। কিন্তু ডেপুটী-বাবু আসিয়া যখন সেরূপ কোন ব্যবস্থাই করিলেন না, কেবল পরের পয়সায় চব্য-চোষ্য খাইয়া, গরীব লোকগুলার কিছু কিছু লোক্‌সান করিয়া চলিয়া গেলেন, অধিকন্তু তাঁহার নিকট তাহাদের উৎসাহদাতা ব্রজনাথকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইতে দেখিল, তখন একটা নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া সকলের উৎসাহ ও উদ্যমকে ম্লান করিয়া দিল; আরব্ধ-কার্য্যকে একটা নিষ্ফল পরিশ্রম বলিয়া অনেকেই ধারণা করিয়া লইল।

এ দিকে মুকুন্দ ঘোষ, ভৈরব চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রবীণগণ—যাঁহারা ব্রজনাথের কার্য্যের বিরোধী ছিলেন, ডেপুটী-বাবুর ভাব-গতিক দেখিয়া তাঁহারা যেন আর একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, এবং অনেকটা প্রকাশ্যভাবেই ব্রজনাথের কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সাধারণে যেন অধিকতর নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সুতরাং আরব্ধ-কার্য্যের পরিসমাপ্তি ব্রজনাথের পক্ষে যেন দুর্ঘট হইয়া উঠিল।

তথাপি ব্রজনাথ নিরস্ত হইল না; ডেপুটী-বাবু চলিয়া যাইবার পর হইতে এক মাস যাবৎ ছুটাছুটি করিয়া, অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া, সকলকে না হউক, অনেককে কতকটা উৎসাহিত করিলেন, এবং সেই সকল লোককে লইয়া পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিল। কিন্তু যাহারা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, দুই একজন ছাড়া তাহারা প্রায় সকলেই প্রতিশ্রুত

ভঙ্গ করিল। ইহাতেও ব্রজনাথের উদ্যম ভঙ্গ হইল না, সে নিজ হইতে টাকা দিয়া আরব্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিবে সঙ্কল্প করিল। তবে কাজ আর তেমন পূর্ণোদ্যমে চলিল না, অল্প লোক লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

বিরুদ্ধবাদীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; যে অল্পসংখ্যক মজুর কাজে লাগিয়াছিল, তাহাদের কাণ-ভাঙানি দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে ব্রজনাথ মজুর পাইল না, কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। তথাপি ব্রজনাথ হতাশ হইল না। সে একদিন নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ডাকাইয়া, উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় তাহাদিগকে এই পুষ্করিণীর উপকারিতা বুঝাইয়া দিল, পরিশেষে সে নিজ হাতে কোদাল ধরিয়া মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লজ্জিত হইল এবং ব্রজ-নাথের হাত হইতে কোদাল কাড়িয়া লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, পুকুরে একবিন্দু পাঁক থাকিতে তাহারা অন্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

পরদিন শতাধিক মজুরকে কাজ করিতে দেখিয়া ভৈরব চক্রবর্ত্তী নায়েব মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, "দূর হোক্ গে নায়েব মশায়, পুকুরটা যদি হয়—হ'য়ে যাক্, তবু দিনকতক ভাল জলটা খাওয়া যাবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই ভাল জলের উপর রুচির মধ্যে যে অনেকখানি শ্লেষ নিহিত রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া নায়েব মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মতি হাজরার ছেলের পুকুরের জল যেমন তেমন ক'রে খেলে চ'লবে না চক্রবর্ত্তি, গলায় কলসী বেঁধে মাঝ-পুকুরে ডুব দিয়ে যতক্ষণ দম থাকে, ততক্ষণ জল খেতে হবে।

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তা' হ'লে দেখ্‌ছি, অনেকগুলো কলসীর বায়না দিতে হবে।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "বায়না দিবার সময় আমার কলসীটা বাদ দিয়ে বায়না দেবেন।"

সহাস্যে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "কেন, আপনি জল খাবেন না বুঝি?"

নায়েব। পুকুরে জল উঠ্‌লে তো খাব।

চক্র। আপনি মন্ত্রবলে জল ওঠা বন্ধ ক'রে রাখ্‌বেন নাকি?

নায়েব। নিশ্চয়। জানেন না কি, জমিদারের আমলারা পুকুর চুরি ক'র্ত্তে পারে।

চক্রবর্ত্তী উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, বামুনের ছেলে—কায়েতের মন্ত্রের জোরটাই একবার দেখ্‌বো।"

মৃদু-গম্ভীর হাস্য-সহকারে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "মুকুন্দ ঘোষের মন্ত্রের জোরে ডেপুটী-চুরি দেখেও কি আপনার বিশ্বাস হয় নি?"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "সে কথা যথার্থ। এমন হাল ইংরিজী ফ্যাসানের তিরিক্ষি মেজাজ ডেপুটী—তা'কে যে কি ক'রে হাত ক'র্‌লেন, তাই আশ্চর্য্য। তবে আজ পুকুরে শ'খানেক মজুর লেগেছে দেখে মনটা যেন কেমন হ'য়ে গেল।"

ধীর-গম্ভীর-কণ্ঠে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "আজ এক'শো লেগেছে, কাল বোধ হয় একজনও লাগ্‌বে না।"

তখন উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গুপ্ত পরামর্শ চলিল। পরামর্শ-শেষে গিরিশ সরকারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিরাজ যেদিন ব্রজনাথের বাটীতে গিয়াছিল, তাহার পরদিন সকালে ব্রজনাথ পুকুরধারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মজুররা সকলেই উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কাজ করে নাই, পুকুরের পাড়ে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে এরূপে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মজুররা ব্রজনাথকে জানাইল যে, পুকুরের মালিক সরকার মশায়রা তাহাদিগকে মাটী কাটিতে নিষেধ করিয়াছে। শুনিয়া ব্রজনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ গিরিশ সরকারের নিকট উপস্থিত হইয়া মাটী কাটিতে নিষেধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে গিরিশ সরকার বলিলেন যে, এ ভাবে সাধারণকে পুকুর ছাড়িয়া দিতে সরিকরা সকলে রাজি নহে।

ব্রজনাথ শুনিয়া চমৎকৃত হইল। সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, যেরূপ সর্ত্তে পুকুর লওয়া হইয়াছে, তাহাতে রাজি না হইবার কোনই কারণ নাই; তাঁহাদের স্বত্ব লোপ পাইতেছে না, অধিকন্তু তাঁহারা বিনা ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে সমস্ত সুবিধাটুকুই উপভোগ করিবেন।

গিরিশ সরকার কিন্তু বুঝিলেন না; তিনি বলিলেন, অপরের পরিশ্রমের ফল এরূপে উপভোগ করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক; ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিতেছেন। তাঁহারা এখনও এরূপ অক্ষম হইয়া পড়েন নাই যে, পরের সাহায্যে নিজের পুকুর কাটাইয়া লইবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহারা নিজ ক্ষমতাতেই ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন।

এই অকৃতজ্ঞতা ও শঠতায় ব্রজনাথ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। সে রাগিয়া বলিল, "তবে আগে রাজি হ'লেন কেন?"

গিরিশ সরকার উত্তর করিলেন, "তখন তোমার মিষ্ট-কথায় ভুলে রাজি হ'য়েছিলাম।"

ব্রজনাথ বলিল, "যখন আগে রাজি হ'য়েছিলেন, তখন এখনো রাজি হ'তে হবে। পুকুর অর্দ্ধেকের বেশী কাটা হ'য়ে গিয়েছে, এ সময়ে 'না' ব'ল্‌লে চ'ল্‌বে না।"

গিরিশ সরকার বলিলেন, "আমার পুকুর, আমি হ'শো বার 'না' ব'ল্‌বো, তোমার ক্ষমতা থাকে 'হাঁ' কর।"

"বেশ, তাই হোক্‌।"

ব্রজনাথ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া মজুরদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে হুকুম দিল। হুকুম পাইয়া মজুরদাররা মহোৎসাহে হরি-ধ্বনি করিয়া মাটী কাটিতে লাগিল। গিরিশ সরকার ও অপর সরিকের একটী বালক ছুটিয়া আসিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহারা মজুরদের হাত হইতে কোদালি কাড়িয়া লইতে গেলেন। কিন্তু ব্রজনাথের হুকুম পাইয়া মজুররা তখন উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা গিরিশ সরকারকে ঠেলিয়া দিয়া মাটী কাটিতে থাকিল। এইরূপ ঠেলা-ঠেলিতে গিরিশ সরকার পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কর্দ্দমাক্ত হইল, একটা ইটের কুঁচি লাগিয়া মাথার এক জায়গা একটু ছিঁড়িয়া গেল, সেই ক্ষতস্থান হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিতে লাগিল। গিরিশ সরকার আর্ত্ত-কণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে চীৎকারে চারিদিক্‌ হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। ভৈরব চক্রবর্ত্তী, স্বরূপ ঘোষ, শ্রীরাম দত্ত প্রভৃতি অনেক প্রবীণ লোকও তথায় উপস্থিত হইলেন। গিরিশ সরকার কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের নিকট জানাইলেন যে, ব্রজনাথ জোর করিয়া তাঁহাদের পুকুরের মাটী কাটিতেছে, বাধা দিতে যাওয়ায় সে প্রহার করিয়া তাঁহার মাথা কাটাইয়া দিয়াছে।

উপস্থিত সকলেই এই অন্যায় অত্যাচারের জন্য গিরিশ সরকারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। ভৈরব চক্রবর্ত্তী ডাক্তার ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার নিতাই মণ্ডল আসিয়া গিরিশ সরকারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। তখন কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য গিরিশ সরকারকে লইয়া সকলে গ্রামের মস্তকস্বরূপ নায়েব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল।

খানিক পরে সেখান হইতে ব্রজনাথের ডাক আসিল। ব্রজনাথের যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কেননা এই গোলযোগের মুলে যে নায়েব মহাশয় আছেন, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। তথাপি ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে নায়েব মহাশয়ের আহ্বান উপেক্ষা করিল না।

ব্রজনাথ উপস্থিত হইলে, নায়েব মহাশয় এরূপ ছেলে-মানুষী করার জন্য তাহাকে সস্নেহ তিরস্কার করিলেন; তার পর ব্যাপারটা মিটাইয়া লইবার জন্য গিরিশ সরকারকে অনুরোধ করিলেন। গিরিশ সরকার কিন্তু এতবড় অপমানটা মাথা পাতিয়া লইয়া আপোসে মিটমাট করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে ভৈরব চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রবীণগণের বিস্তর অনুরোধ উপরোধে বাধ্য হইয়া এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন, ব্রজনাথ যদি পুকুরের লেখাপড়ার কাগজখানা সর্ব্বসমক্ষে ছিঁড়িয়া ফেলে এবং পুকুরের ধারে আর না যায়, তাহা হইলেই তিনি মিটাইয়া লইতে পারেন।

ব্রজনাথ কিন্তু ইহাতে স্বীকৃত হইল না। নায়েব মহাশয় মিষ্ট-কথায় তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, এবং তিনি যে জমিদারের খাস যে কোন একটা পুকুর ভবিষ্যতে ব্রজনাথকে ছাড়িয়া দিবেন, এমন প্রতিজ্ঞাও করিলেন। ব্রজনাথ কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞার মুল্য বুঝিত, সুতরাং সে কিছুতেই আপনার জেদ ছাড়িল না, অধিকন্তু নায়েব মহাশয়ের সস্নেহ অনুরোধের উত্তরে তাঁহাকে দুই চারিটা কড়া কড়া

কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। অগত্যা নায়েব মহাশয় নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাসের সহিত শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া নিরস্ত হইলেন। গিরিশ সরকার সেই দিনই মহকুমায় গিয়া ব্রজনাথের নামে অনধিকার-প্রবেশ ও মার-পিটের মোকদ্দমা রুজু করিয়া আসিলেন।

পুকুর-কাটা বন্ধ রহিল। ব্রজনাথ সরকারদের নামে সর্ত্ত-ভঙ্গের নালিশ করিতে পারে কি না তাহার পরামর্শ লইবার জন্য উকীলের কাছে যাতায়াত করিতে লাগিল।

উকীলেরা পরামর্শ দিল যে, রেজেষ্টারী দলিল না হইলেও পাঁচ জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত কাগজ লইয়াও নালিশ চলিতে পারে, এবং এক্ষেত্রে সত্বর নালিশ রুজু করা আবশ্যক। নতুবা বিবাদী পক্ষ অনধিকার-প্রবেশের অজুহাতে যে মোকদ্দমা আনিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইয়া শাস্তি হইতে পারে। উকীলদের পরামর্শ অনুসারে ব্রজনাথ মামলা রুজু করিয়া দিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"হাঁ রে ব্রেজো, তুই নাকি গিরিশ সরকারের নামে মামলা ক'চ্ছিস্?"

ব্রজনাথ উত্তর করিল, "হাঁ নতুন-মা, ওদের তিন সরিকের নামেই মামলা রুজু ক'রে এসেছি।"

আমোদিনী বলিলেন, "তা বেশ ক'রেছিস্। আমিও ভাবছিলাম, এত বড় মামলাবাজের ছেলে মামলা মোকদ্দমা না ক'রে এখনো চুপ ক'রে আছে কেন।"

আমোদিনী ঈষৎ হাসিলেন। ব্রজনাথ বলিল, "বাবা মামলা ক'ত্তেন

ব'লে আগে আমার রাগ হ'তো নতুন-মা, কিন্তু এখন দেখ্‌চি, তিনি সাধ ক'রে মামলাবাজ হ'ন নি। দেশের লোকগুলা এমন কুটিল যে, আইন দিয়ে শাসন ক'ত্তে না পার্‌লে এরা কিছুতেই শান্ত হয় না।"

স্বরে একটু শ্লেষের তীব্রতা আনিয়া আমোদিনী বলিলেন, "দেশেরও সম্পূর্ণ উন্নতি হয় না।"

মাথা নাড়িয়া ব্রজনাথ বলিল, "তুমি বোঝো না নতুন-মা, দেশের উন্নতি ক'ত্তে হ'লে দু'একটা মামলা মোকদ্দমা করাও দরকার। এরা যতই ভাল মানুষ দেখ্‌বে, ততই ঠকাবার চেষ্টা কর্‌বে। কুটিলতা, অকৃতজ্ঞতা, প্রতারণা যেন এদের মজ্জাগত দোষ হ'য়ে পড়েছে, ভাল কাজে বাধা দেওয়া যেন এদের জন্মগত সংস্কার। নিজেরা ভাল কাজ ক'ত্তে পারবে না, অপরকেও ক'ত্তে দেবে না। কাজেই দু'একটা মামলা ক'রে এদের শিক্ষা না দিলে এই লোকগুলাকে নিয়ে কোন একটা উন্নতির কাজ হ'তেই পারে না।"

গম্ভীরভাবে আমোদিনী বলিলেন, "সে কথা ঠিক্ বেজো। মামলা মোকদ্দমা ক'রে আগে এদের উচ্ছন্নে দিয়ে তারপর এদের উন্নতির চেষ্টা করিস্। বুদ্ধিমানের কাজই তো এই।"

এই সশ্লেষ তিরস্কারে একটু লজ্জিত হইয়া ব্রজনাথ বলিল, "নির্ব্বোধ ব'লে তুমি আমাকে তিরস্কার ক'ত্তে পার নতুন-মা, কিন্তু অন্তের অপেক্ষা না রেখে এরা নিজে নিজেই যে উচ্ছন্নে গিয়েছে, এই সত্যটা তুমি কিছুতেই অস্বীকার ক'ত্তে পার্‌বে না।"

আমোদিনী বলিলেন, "সেটা আমি স্বীকার ক'রে নিচ্চি বেজো, কিন্তু সেই সঙ্গে এই সত্যটাও স্বীকার ক'ত্তে বাধ্য, আপনা হ'তে এদের উচ্ছন্নে যেতে যেটুকু বাকী আছে, তুই এবার সেটুকু শেষ ক'রে দিবি।"

এ অনুযোগের উত্তর দিতে ব্রজনাথ অক্ষম হইল। সে নীরবে কিছুক্ষণ

ভাবিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও নতুন-মা, এই মামলা রুজু করা আমার পক্ষে অন্যায় হ'য়েছে?"

আমোদিনী বলিলেন, "সম্পূর্ণ অন্যায়। আমি জানি, দেশের লোকের দোষ অনেক। কিন্তু তুই যখন তাদের শিক্ষাদাতা—পথপ্রদর্শক হ'তে ইচ্ছা ক'রেছিস্, তখন তোকেই আগে বাঁকা রাস্তা ছেড়ে সোজা রাস্তায় চ'ল্‌তে হবে। নিজে মদ খেয়ে অপরকে মদ খেতে নিষেধ ক'র্‌লে তা'র নিষেধ কোন লোকেই গ্রাহ্য করে না, বরং উপহাস করে। দেশ উচ্ছন্নে গিয়েছে শুধু মামলা মোকদ্দমায়। তুই যদি দেশের উন্নতি ক'র্ত্তে চাস্, তবে আগে মামলা মোকদ্দমার পথ বন্ধ কর্। কিন্তু নিজে মামলা ক'রে অপরকে মোকদ্দমা ক'র্ত্তে নিষেধ্ ক'র্‌লে কে তোর কথা শুন্‌বে বেজো।"

আমোদিনীর উক্তির সার্থকতা অনুভব করিয়া ব্রজনাথ চিন্তা-গম্ভীর ভাবে বলিল, "কিন্তু ওরা আগে আমার নামে মামলা রুজু ক'রেছে।"

আমোদিনী বলিলেন, "ওরা আগে মামলা রুজু করেছে, তাই তুই পরে রুজু ক'রেছিস্, সাধারণ স্বার্থের দিক্ দিয়ে এ কৈফিয়ৎটা তোর সাফাই হ'তে পারে, কিন্তু দেশের উন্নতির দিক্ দিয়ে ধ'র্‌তে গেলে এ উত্তরটা একটা হাস্যকর কৈফিয়ৎ হ'য়ে পড়ে। ঢিলটী মার্‌লে যে তার জবাবে পাটকেলটী মারে, তার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু তাতে যে ঢিল মারে, তার ঢিল-মারা প্রবৃত্তির একটুও সংশোধন হয় না, বরং সে প্রবৃত্তি অনেকটা উত্তেজিত হ'য়েই পড়ে।"

নতমস্তকে ব্রজনাথ বলিল, "সে কথা ঠিক নতুন-মা, এখন বুঝ্‌ছি, মামলাটা রুজু করা বাস্তবিকই অন্যায় হ'য়েছে। [illegible] নিলে ওরা যে মামলা এনেছে, তাতে হয় তো আমাকে সাজা পেতে হবে।"

প্রদীপ্ত-কণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "সে শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে ওদের

উপকার ক'র্‌বার মত ধৈর্য্য যদি তোর না থাকে বেজো, তবে দেশের হিত-চিন্তা করাই তোর পক্ষে বিড়ম্বনা। দেশের উন্নতি—পরের উপকার খুব ছোট কথা নয় বেজো, অনেকখানি স্বার্থত্যাগ, অনেক সাধনা, অনেক সংযম এর মধ্যে থাকা দরকার। অপরের দোষ সংশোধন ক'ত্তে হ'লে কতটা সহিষ্ণুতার দরকার, তা' দেখিয়ে দিয়েছেন নিত্যানন্দ প্রভু। জগাই মাধাই যখন কলসীর কাণা মেরে তাঁর মাথায় রক্তপাত ক'রেছিল, তখন তিনি হাস্‌তে হাস্‌তেই ব'লেছিলেন—'মেরেছ কলসীর কাণা, তা ব'লে কি প্রেম দেব না।' তবে না জগাই মাধাই তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়েছিল—মহাপাপীর উদ্ধার হ'য়েছিল? এমনি ক'রে কলসীর কাণার আঘাতকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে যদি প্রেম বিলাতে পারিস্ বেজো, তবেই দেশের উদ্ধার বল—উন্নতি বল, সব হবে, নয় তো হাজার হাজার মামলা—লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কর্‌লেও দেশের প্রকৃত উন্নতি যা' তা' এক বিন্দুও হবে না।"

আমোদিনীর মহিমা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজনাথ যেন আত্মবিস্মৃত হইল। সে তাঁহার পায়ের তলায় মাথা নীচু করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর নতুন-মা, কলসীর কাণার আঘাত চিরদিন যেন হেসেই উড়িয়ে দিতে পারি।"

ব্রজনাথ যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চোখের সাম্‌নে একটা নূতন আলো, মনের ভিতর একটা নবীন উদ্যম; সকল নৈরাশ্য, সমস্ত বিষণ্ণতা মুহূর্ত্তে মুছিয়া গিয়া নূতন আশায় ও উৎসাহে মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে উঠিয়া ব্রজনাথ মহকুমায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমোদিনী বলিলেন, "আজ শনিবারটায় নাই বা গেলি?"

ব্রজনাথ বলিল, "না নতুন-মা, দেরী ক'র্‌লে হয় তো ওদের নামে শমন চ'লে আস্‌তে পারে। শমন বা'র হ'বার আগেই মামলাটা বন্ধ ক'রে দেওয়া ভাল।"

আমোদিনী আর বাধা দিলেন না।

প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সেখানে পৌছিয়া, উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া মামলা তুলিয়া লইবার দরখাস্ত দাখিল করিতেই অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। তার পর দোকানে জলযোগ সম্পন্ন করিয়া ব্রজনাথ যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব নাই। ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তবে অন্ধকার হইল না; শুক্লাষ্টমীর চাঁদ সন্ধ্যার অনেক আগে হইতেই মধ্যাকাশে আসিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং চাঁদের আলোর সাহায্যে পথ অতিবাহন করিতে তেমন কষ্ট হইল না।

মহকুমায় গিয়া, উকীলকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া

গাঁয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন অপরাহ্ণ। কবিরাজ তেমন অপরাহ্ণে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না, পরদিন প্রাতে উঠিয়া আসিবেন স্বীকার করিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া বাহির হইতে সন্ধ্যা হইল। তখনও তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। সুবিধার মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোক ছিল। সেই আলোর সাহায্যে ব্রজনাথ মাঠের পথ ধরিয়া চলিল।

কিন্তু অল্প দূর আসিতেই সে সুবিধাটুকু নষ্ট হইল—পশ্চিমে একটা

একটু করিয়া মেঘ উঠিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল। অন্ধকারে হোঁচট্ খাইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রজনাথকে পথ অতিবাহন করিতে হইল।

এইরূপে বহু কষ্টে তিন ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া ব্রজনাথ যখন গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর; গ্রাম সুষুপ্ত, পথ নির্জ্জন। তখন মেঘের ঘোর অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, পাত্‌লা মেঘের ভিতর দিয়া যে মৃদু জ্যোৎস্নার আলোটুকু ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে পথ আলোকিত না হইলেও অন্ধকার অনেকটা তরল হইয়া আসিয়াছে। সেই আলোক-অন্ধকার-মিশ্রিত গ্রাম্য পথ ধরিয়া ব্রজনাথ দ্রুত চলিতে লাগিল।

জমিদারের কাছারী-বাড়ীর পাশ দিয়া রাস্তা। ব্রজনাথ যখন কাছারী-বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন সহসা কাছারীর ভিতর হইতে "চোর চোর, ধর্ ধর্" ইত্যাদি রবে একটা কোলাহল উত্থিত হইল। ব্রজনাথ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এমন সময় তাহার পাশ দিয়া দুইটা লোক শ্বাসে ছুটিয়া গেল। ব্রজনাথের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কাছারীতে চুরী হইতেছিল, এবং এই পলায়মান লোক দুইটা চোর ভিন্ন আর কেহই নহে। মুহূর্ত্তে কথাটা ভাবিয়া লইয়া ব্রজনাথ তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত তাহারা যে পথে ছুটিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া ছুটিল। কিন্তু কয়েক পদ যাইতেই সহসা পশ্চাৎ হইতে একটা লাঠী আসিয়া পায়ের গোছে পড়িল; ব্রজনাথ মুখ থুবড়িয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিজন লোক আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

সকালে গ্রামে প্রচার হইল, গত রাত্রিতে ব্রজ হাজরা বিশ পঁচিশ জন লাঠিয়াল লইয়া কাছারী-বাড়ী লুট করিয়াছে। লাঠিয়ালরা সকলেই পলাইয়াছে, কিন্তু ব্রজ হাজরা পলাইতে পারে নাই; পলায়নকালে কাছারীর পাইক নফর বাগের লাঠীতে আহত হইয়া ধরা পড়িয়াছে।

গ্রামের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কথাটা যে শুনিল, সে-ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনেকেই কথাটায় বিশ্বাস করিল

পারে; এই যে এত পুকুর কাটান, জঙ্গল পরিষ্কার, ইস্কুল করিবার মতলব—মতি হাজরার ছেলে কি এমনই পাগল যে, ঘরের পয়সা ব

এইরূপ

অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশহিতৈষী বলিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টায় আছে। সেদিন যে লতিফপুরে ডাকাতিটা হইয়া গেল, খুব সম্ভব সেই ডাকাতির মধ্যেও ব্রজ হাজরার যোগ আছে।

সকলেই কিন্তু এইরূপ ভাবিল না; দুই চারি জন বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাবিলেন, ভিতরে অনেক গোলযোগ আছে।

যাহা হউক, প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্য গ্রামের লোক দলে দলে কাছারী-অভিমুখে ছুটিল।

বিরাজও কথাটা শুনিল; শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইল। কল্যাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুই একবার তাদের বাড়ীতে গিয়ে জেনে আয় রাজু। আমার তো বিশ্বাস হ'চ্ছে না।"

বিরাজ বলিল, "গাঁ-শুদ্ধ লোক বুঝি মিছে কথা ব'লছে?"

কল্যাণী ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন, "না, সত্যি কথা ব'লছে। বেজো সত্যি সত্যি ডাকাতি ক'ত্তে গিয়েছিল?"

ভারী-মুখে বিরাজ বলিল, "ডাকাতি ক'ত্তে গিয়েছিল, কি খুন ক'ত্তে গিয়েছিল, সে কথা তোমার বেজোই জানে, আমি তার কি জানবো।"

কল্যা। বাড়ীতে গেলেই তো সব খবর পাবি।

বিরা। আমি এখন যেতে পারবো না। খালা পুলিশ আসবে, তারদিকে হৈ হৈ প'ড়ে গিয়েছে, এখন সময় বুঝি যাওয়া যায়!

বলিয়া বিরাজ মাতার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু কাজে মন

দিতে পারিল না, সদর দরজায় গিয়া, কাছারীর দিক্ হইতে কোন লোক ফিরিতেছে কি না, তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকিল। কিন্তু সে দিকে যাইতে অনেক লোককে দেখিল, ফিরিতে কাহাকেও দেখিল না। অনেকক্ষণ পরে গ্রামের দুই তিন জন লোককে ফিরিতে দেখা গেল বটে, কিন্তু বিরাজ তাহাদিগকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; তাহারা সম্মুখস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিয়া, কিন্তু কথাটা ঠোঁটের কাছে আনিয়া কেমন যেন বাধিয়া গেল, বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। লোকগুলা দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। বিরাজ বিরক্তভাবে দরজার নিকট হইতে সরিয়া আসিল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম'ণে কোথায় গেল?"

"কেন?"

"তাকে একবার জান্‌তে পাঠালে হ'তো।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিরাজ বলিল, "হাঁ, সে ছেলে-মানুষ, গিয়ে তোমাকে সব খবর এনে দেবে।"

কল্যাণী চুপ করিলেন। বিরাজ তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, কার কি হ'লো না হ'লো জান্‌বার জন্তে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল তো? তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। দত্ত-বৌয়ের কাঁথা-খানা আজ শেষ ক'রে দিতে হবে, মনে আছে তো?"

অগত্যা কল্যাণী বিষণ্নচিত্তে কাঁথা সেলাই করিতে বসিলেন। কিন্তু কাজে মন বসিল না, মেয়েটার এক গুঁয়েমির কথা ভাবিয়া বিরক্ত-চিত্তে কাঁথার উপর হুচ চালাইতে লাগিলেন।

এমন সময় মণি ছুটিয়া আসিয়া মাকে জানাইল যে, ব্রজনাথ ধরা পড়িয়া কাছারীতে আবদ্ধ আছে। কল্যাণী তাহাকে আসল খবরটা জানিয়া আসিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। বেশী অনুরোধ করিতে

হইল না, আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মণি তিন লাফে বাটীর বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

বিরাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ম'ণে লাফাতে লাফাতে কোথায় গেল ?"

কল্যাণী বলিলেন, "বেজোর খবর আন্‌তে তা'কে পাঠিয়েছি।"

রাগে মুখ বিকৃত করিয়া বিরাজ বলিল, "খুব কাজ ক'রেছ ! দারোগা, চৌকিদার, পুলিশ গিস্ গিস্ ক'চ্চে, তার ভেতর ঐ একরত্তি ছেলেটাকে খবর আন্‌তে পাঠালে ! আচ্ছা বুকের পাটা তো তোমার ?"

কল্যাণীও রাগিয়া বলিলেন, "তা' কি ক'র্‌বো বল্, আমি তো তোর মত পাষাণী নই যে, তার এমন একটা বিপদ্ শুনে নিশ্চিন্দি ব'সে থাক্‌বো ! বেজো আমার ছেলের চাইতে বেশী তা' জানিস্। উপায় থাক্‌লে আমি নিজেই ছুটে যেতাম।"

তীব্র-কণ্ঠে বিরাজ বলিল, "হাঁ, সে ডাকাতি ক'ত্তে গিয়ে ধরা প'ড়েছে, তুমি সেখানে ছুটে না গেলে চ'ল্‌বে কেন ?"

ক্রোধে চীৎকার করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "মুখ সাম্‌লে কথা কইবি রাজি, বেজো যেদিন ডাকাতি ক'ত্তে যাবে, সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠ্‌বে। তোর এতবড় সাধ্যি, তুই বলিস্, সে ডাকাতি ক গিয়েছিল !"

গম্ভীর-মুখে বিরাজ বলিল, "দেশশুদ্ধ লোকে ব'ল্‌ছে যে ?"

উত্তেজিত-কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "দেশ-শুদ্ধ লোক কি, লোকে ব'ল্‌লেও আমি বিশ্বাস করি না। তুই বিশ্বাস করিস্ ?

-গলায় "আমি জানি না" বলিয়া বিরাজ মুখ ফিরাইয়া লইল।

ব্রজনাথের সম্বন্ধে বিরাজ মুখে যতটা ঔদাস্য প্রকাশ করিল, ভিতরে এতটা ঔদাস্য ছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু মণির ফিরিতে যতই বিলম্ব

হইতে লাগিল, ততই সে যেন অধীর হইয়া উঠিল। সে অধীরতা মণির ফিরিবার জন্য কতটা, আর ব্রজনাথের সংবাদ পাইবার জন্যই বা কতটুকু, তাহার নির্দ্ধারণ করা তাহার নিজের কাছেই যেন কঠিন হইয়া উঠিল। সে কখন বা সদর-দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেছিল, কখন বা ছেলেটাকে এই গোলমালের মধ্যে পাঠাইবার জন্য মাতাকে তিরস্কার করিতেছিল, আবার এক এক বার ম'শে হতভাগা কোথাও গেলে যে সহজে ফিরিতে চায় না, ইহাই ব্যক্ত করিয়া তাহার উদ্দেশে বিস্তর অনুযোগ করিতেছিল। কল্যাণী তাহার কথার একটাও উত্তর না দিয়া কাজ করিতে করিতে শুধু এক একবার বাহিরের দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে মণি ফিরিয়া আসিল, এবং কল্যাণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাইল যে, দারোগা-বাবু ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া থানায় চলিয়া গিয়াছেন। কল্যাণী শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজ উনানে তরকারীর হাঁড়ীটা চাপাইয়া তাহাতে তরকারীগুলা ঢালিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু তরকারীগুলা হাঁড়ীতে দেওয়া হইল না, তরকারীর চুপ্‌ড়ীটা হাতে ধরিয়া সে এমন তন্ময়চিত্তে মণির কথা ...ল যে, হাঁড়ীর দিকে লক্ষ্যই রহিল না। শেষে শুকনা ... আগুনের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া যখন বিকট-শব্দে ফাটিয়া উঠিল, তখন সেই শব্দে বিরাজের যেন চেতনা হইল, এবং অপ্রতিভভাবে চুপ্‌ড়ীর তরকারীগুলা তাড়াতাড়ি হাঁড়ীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। কিন্তু শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ীর তলার আধখানা যে উড়িয়া গিয়াছিল, সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না; সুতরাং তরকারীগুলা হাঁড়ীতে স্থান না পাইয়া জলন্ত উনানের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল। বিরাজ রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রন্ধনশালার বাহিরে চলিয়া আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রজনাথ চালান গেলে গ্রামের লোক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু নায়েব মহাশয় একটুও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, ব্রজনাথের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লুঠের অপরাধে ব্রজনাথ ধরা পড়িয়াছিল বটে, এবং অপরাধীকে আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নায়েব মহাশয় ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যেন সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। আহা, ছেলে-মানুষ—না জানিয়া যদি একটা অপরাধ করিয়া থাকে, তবে সে জন্য তাহাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা ভদ্রলোকমাত্রেরই উচিত নহে।

এজন্য প্রথমতঃ থানায় সংবাদ দিতেই নায়েব মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারটা গোপন করিলে পাছে আইনের অমর্য্যাদা হয়, এবং আইন অনুসারে তিনি নিজেই অপরাধী হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে থানায় সংবাদ দিতে হইল। তারপর দারোগা নায়েব মহাশয় মিনতি-সহকারে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ছেলে-মানুষ, না জানিয়া অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এক্ষণে উহাকে যদি আইনের অবমাননা না হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রজনাথকে দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দারোগা-বাবু যখন তাঁহাকে দিলেন যে, ইহাতে শুধু আইনের অবমাননা হইবে না, সম্পূর্ণরূপে আইন লঙ্ঘন করা হইবে, তখন নায়েব মহাশয় এরূপ নীতি-বিগর্হিত দুষ্কর্ম্ম-স সাহসী না হইয়া দারোগা-বাবুকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বলিলেন। দারোগা-বাবু যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া ব্রজনাথের কিছু বক্তব্য আছে না জানিতে চাহিলেন। ব্রজনাথ কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই

বলিতে চাহিল না। দারোগা-বাবু তখন ব্রজনাথকে চালান দিতে প্রস্তুত হইলেন।

কেবল ব্রজনাথকে চালান দিয়াই দারোগা-বাবু সন্তুষ্ট হইলেন না, এই ডাকাতিতে আর যে সকল লোকের যোগ ছিল, তাহাদের নাম জানিতে প্রয়াসী হইলেন। ব্রজনাথ কিন্তু কাহাকেও আপনার সঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিল না। অগত্যা তখন অনুমানের উপরেই নির্ভর করিতে হইল। যে সকল মজুর পুকুর কাটিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই বাছিয়া বাছিয়া দশ বারো জন জোয়ান্‌কে ধরিয়া আনা হইল। কিন্তু অনেক উৎপীড়নেও যখন তাহারা লুঠের কথা স্বীকার করিল না, বা ব্রজনাথকে আপনাদের দলপতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিল না, অগত্যা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল ব্রজনাথকে লইয়াই দারোগা-বাবু প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় নায়েব মহাশয় ব্রজনাথকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক বলিয়া দিলেন যে, তাহার কোন চিন্তা নাই, যাহাতে সে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে, তজ্জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না।

পুলিসের সহিত জনতাও একে একে প্রস্থান করিলে নায়েব মহাশয় ব্রজনাথের জন্য যথেষ্ট আক্ষেপ-প্রকাশপূর্ব্বক ভৈরব চক্রবর্ত্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি ক'র্‌বো বলুন চক্রবর্ত্তী মশায়, এ সব আইনের হাত, ভদ্রলোক হ'য়ে কোন্ লজ্জায় আইনের অপমান করি। আমরাই যদি আইন না মানি, তবে ছোট লোকেরাই বা আইন মান্‌বে কেন? কাজেই আইনের উপর কোন কথা কইতে পার্‌লাম না। নইলে আমার ইচ্ছা ছিল, যা' হ'বার হ'য়ে গিয়েছে, ছোঁড়াকে ছেড়ে দিই।"

উপস্থিত সকলেই নায়েব মহাশয়ের এই সহৃদয়তার প্রশংসা করিতে লাগিল। ভৈরব চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আপনি সরল-প্রকৃতির লোক কিনা, তাই এমন কথা কইচেন। অপর কেউ হ'লে ওর হাতে আগে হাতকড়ি দিতে ব'ল্‌তো।"

মাথা দোলাইয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন, "রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম! ভদ্রলোকের ছেলে—কি ব'লেন মশায়। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, নিজে জামিন হ'য়ে ছাড়িয়ে আনি। কিন্তু তা'তে মনিবের কাছে দোষ পেতে হবে। গোবিন্দ হে, তোমারি ইচ্ছা!"

গোবিন্দের ইচ্ছায় ব্রজনাথ যেদিন জামিনে মুক্তি পাইয়া ফিরিয়া আসিল, সেদিন নায়েব মহাশয় স্বয়ং ব্রজনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ-প্রকাশ করিলেন, এবং কেবল মনিবের ভয়েই যে তিনি মামলা চালাইতে বাধ্য, নতুবা ব্রজনাথকে দণ্ডিত করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, ইহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন। সেই সঙ্গে অপরাধ অস্বীকার করিয়া মামলার তদ্বির করিবার জন্য ব্রজনাথকে অনেক পরামর্শও দিলেন; কিন্তু ব্রজনাথ নিজের স্বপক্ষে কোন কথা বলিতে, অধিক কি, উকীল পর্য্যন্ত দিতে যখন অস্বীকার করিল, তখন নায়েব মহাশয় এরূপ ছেলে-মানুষীর জন্য সস্নেহ তিরস্কার করিতে করিতে বিষণ্ণচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

কেবল নায়েব মহাশয় কেন, গ্রামের অনেক লোকই মামলার তদ্বির করিবার জন্য ব্রজনাথকে পরামর্শ দিল, এবং তাহারা ব্রজনাথের সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। ব্রজনাথ কিন্তু মামলার তদ্বিরের কোন-রূপ চেষ্টাই করিল না, এবং আপনার নির্দ্দোষতা প্রমাণিত করিবার জন্য কাহাকেও সাক্ষী মানিল না। ইহাতে পরামর্শ-দাতারা শুধু ব্রজনাথের উপর বিরক্ত হইল না, তাহার নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহানও হইল। তাহাদের সন্দেহে ব্রজনাথ ভ্রূক্ষেপ করিল না।

এদিকে মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ক'রবি রে বেজো?"

ব্রজনাথ উত্তর করিল, "তুমিই বল না নতুন-মা, কি করা উচিত?"

আমোদিনী বলিলেন, "একজন ভাল উকীল দে, ক'লকাতা থেকে

একজন ব্যারিষ্টার নিয়ে আয়। তোর পক্ষে অনেকেই সাক্ষী দিতে চাইচে, তা' ছাড়া টাকা খাইয়ে ওদের সাক্ষীদেরও ভাঙ্গিয়ে নিতে পারি।"

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল, "তুমিও যে দেখ্‌ছি, মস্ত মামলা-বাজ হ'য়ে প'ড়্‌লে নতুন-মা!"

আমোদিনী বলিলেন, "মামলা-বাজ কি রে, এতবড় একটা সঙ্গীন মামলা, তার তদ্বির ক'স্তে হবে না?"

ব্রজ। কোন প্রয়োজন নাই।

আমো। জেলে যাবি?

ব্রজ। হাস্‌তে হাস্‌তে।

আমোদিনী সবিস্ময়ে ব্রজনাথের ভীতিলেশশূন্য মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছো নতুন-মা?"

আমোদি

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "তোমার ছেলে যে রকম হ'তে পারে, ঠিক্ সেই রকম।"

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে আমোদিনী বলিলেন, "তা' কক্ষণো হবে না বেজো, দু'হাজার পাঁচ হাজার—যত টাকা লাগে আমি দেব, জেলে তোকে কক্ষণো যেতে দেব না।"

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি দু'হাজার পাঁচ হাজার দেবে?"

আমোদিনী বলিলেন, "দরকার হ'লে তার বেশীও দিতে পারি।"

ব্রজ। বেশ, আমি ফিরে এলে টাকাটা দিও। পাঁচ হাজার টাকায় দেশের অনেক কাজ হবে নতুন-মা!

আমো। দেশের কাজে টাকাটা দিয়ে নিজে জেলে যাবি?

তাঁহার চিন্তা-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্রজনাথ বলিল, "তুমিই না

সেদিন ব'লেছিলে নতুন-মা, কলসীর কাণার আঘাতকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে প্রেম বিলাতে না পারলে দেশের উন্নতি হ'তে পারে না।"

আমোদিনী শিহরিয়া উঠিলেন। সর্ব্বনাশ, সেদিন উত্তেজনার বশে যে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই কথাটা মনে করিয়াই ব্রজনাথ আজ জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! এতক্ষণ ব্রজনাথের পাগলামীর জন্য তাহার উপর রাগ হইতেছিল, এক্ষণে আমোদিনী নিজের উপর রাগিয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল; ব্রজনাথের কথার উত্তরে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো নতুন-মা?"

আমো। ভাবচি, সেই কথাটা তুই মনে ক'রে রেখেছিস্?

ব্রজ। মনে রাখবার মত কথা হ'লেই মনে থাকে।

আমো। কিন্তু ও-সব কথার কথা বেজো।

ব্রজ। এর চাইতে ভাল কথা আমি আর শুনতে চাই না নতুন-মা। সেদিন এই একটা কথায় যে নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছ, সে পথ হ'তে আর আমাকে পুরাতন পথের মাঝে টেনে এনো না, এই আমার মিনতি।

আমোদিনী বুঝিতে পারিলেন, ব্রজনাথ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, জেলে যাইতে সে স্থিরসঙ্কল্প; তাহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা দুঃসাধ্য। আমোদিনীর মুখে চিন্তার গভীর ছায়া পতিত হইল, ক্ষোভে দুঃখে চক্ষু দুইটা বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "তেমন কথা আমি কেন ব'লেছিলাম জানিস্?"

ব্রজ। কেন ব'লেছিলে?

আমো। তোর ভালোর জন্যে নয়, যা'তে তোর মন্দ হয়—তুই কষ্ট পাস্, সেই জন্যেই ব'লেছিলাম।

ব্রজ। তা' হ'লে তুমি আমার মন্দ-চেষ্টাই কর?

বাষ্প-জড়িত-কণ্ঠটাকে যতটা পারিলেন সতেজ করিয়া আমোদিনী বলিলেন, "নিশ্চয়। তুই আমার সতীন-পো; সৎ-মা কবে কোথায় সতীন-পোর মঙ্গলের চেষ্টা করে বেড়া!"

আমোদিনীর দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার কথা শুনিয়া ব্রজনাথের হাসি আসিল। কিন্তু সে হাসি চাপিয়া, মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া গম্ভীর-কণ্ঠেই বলিল, "ওঃ, তোমার পেটে পেটে এত দুষ্টবুদ্ধি! আচ্ছা, তোমার কথা যা' শুন্‌বার শুনেছি নতুন-মা, কিন্তু এই আমি ব'ল্‌ছি, আজ থেকে তোমার কথাই আর শুন্‌বো না।"

ব্রজনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া আমোদিনী বলিলেন, "চ'লে যাস্ যে, শোন্।"

মুখ ফিরাইয়া ব্রজনাথ বলিল, "সৎ-মার কথা আবার শুন্‌তে যাব কি?"

হাসিতে হাসিতেই ব্রজনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। আমোদিনী স্তম্ভিত-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন, "হে হরি, হে মধুসূদন, ছেলেটাকে বাঁচাও ঠাকুর!"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গিরিশ সরকার যে মামলা রুজু করিয়াছিলেন, তাহার নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ব্রজনাথ আদালতে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু আপনার স্বপক্ষে কোন কথাই বলিল না। বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া তাহার কোন বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রজনাথ উত্তর করিল, "আমার বক্তব্য কিছুই নাই।" প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক আসামীর পঞ্চাশ টাকা অর্থ-দণ্ড করিলেন। দণ্ডের টাকা জমা দিয়া ব্রজনাথ আদালত হইতে বাহির হইল।

তার পর লুঠের মামলার দিন উপস্থিত হইল। নগদ দেড় হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া নায়েব মহাশয় এজাহার দিয়াছিলেন। পুলিশ টাকার অনুসন্ধানে খানাতল্লাসী করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু খানাতল্লাসীতে নগদ টাকার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য জ্ঞানে, নায়েব মহাশয় খানাতল্লাসী করিতে দিলেন না। বামাল না পাওয়া গেলেও অপরাধী ধরা পড়ায় মামলার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইল না। তা' ছাড়া সাক্ষীরও অভাব হইল না; ভৈরব চক্রবর্ত্তী, গিরিশ সরকার প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোকই ব্রজনাথের অসচ্চরিত্রতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে পুলিশের চেষ্টায় দুই তিন জন ইতর-শ্রেণীর সাক্ষীও সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্রজনাথ কাছারী লুঠ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিতে তাহারা স্বীকৃত হইল।

এইরূপে একপক্ষে মামলার অবস্থা খুব জোর হইয়া উঠিল। কিন্তু অপর পক্ষকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিল, হাকিম হয় তো মোকদ্দমা দায়রায় পাঠাইবে। সুতরাং ব্রজনাথের পরিণাম-চিন্তা করিয়া অনেকেই, এমন কি স্বয়ং নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত চিন্তিত হইলেন, এবং লোকের দ্বারা মোকদ্দমার তাদ্বর করিবার জন্ত ব্রজনাথকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রজনাথ যখন কাহারও উপদেশে কর্ণপাত করিল না, মোকদ্দমা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিল; অগত্যা নায়েব মহাশয় নিরস্ত হইলেন, এবং এই নির্ব্বোধ লোকটা তাহার জড়বৎ নিশ্চেষ্টতার দণ্ড যাহাতে রীতিমত পায়, তজ্জন্য চেষ্টিত হইলেন।

মোকদ্দমার পূর্ব্বদিনে ব্রজনাথ গিয়া কল্যাণীকে প্রণাম করিল। কল্যাণী কাঁদিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার

করিলেন। বিরাজ কিন্তু কাঁদিল না, বা একটু কাতরতা প্রকাশ করিল না, বরং বেশ গম্ভীরভাবেই ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা

করিল, "তোমার জেলে যেতে এত সাধ হ'য়েছে কেন বেজো-দা ?"

ব্রজনাথ হাসিয়া উত্তর করিল, "ঘরের চাইতে জেলখানাটা কত ভয়ঙ্কর জায়গা, তাই একবার দেখে আস্‌বো।"

বিরাজ বলিল, "ঘরটা তা' হ'লে তোমার কাছে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা ?"

"কার কাছেই বা নয়" বলিয়া ব্রজনাথ তাহার মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরাজ বলিল, "কিন্তু তোমার কাছে যতটা ভয়ঙ্কর, এতটা আর কারো কাছে নয়।"

ব্রজনাথ বলিল, "সেটা ঠিক্, আমার যথারণ্যং তথা গৃহং।"

গম্ভীর-মুখে বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ তোমার এতটা বৈরাগ্য হ'লো কেন ?"

ব্রজনাথ বলিল, "বৈরাগ্য আমার একটুও হয় নি রাজু। বরং আসক্তি-টাই খুব বেশী বেশী হ'য়েছে।"

তিরস্কারের স্বরে বিরাজ বলিল, "তাই বুঝি হাত-পা গুটিয়ে জেলে যা'চ্ছো ?"

ব্রজ। হাত-পা ছড়িয়ে দিলেই কি জেলে যেতে হয় না ?

বিরা। তা'তে তবু একটা সান্ত্বনা থাকে।

ব্রজ। আমারও সান্ত্বনা আছে।

বিরা। অহিংসা পরম-ধর্ম্ম এই সান্ত্বনা তো ?

ব্রজ। এতটা ধার্ম্মিক আমি নই রাজু, তবে আমি জেলে গেলে যদি দেশের এতটুকুও উপকার হয়, তবে সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট সান্ত্বনা।

রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া বিরাজ বলিল, "তুমি ফাঁসী গেলে দেশের খুব বেশী উপকার হয়।"

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল, "ততটা সাহস এখনো হয় নি। তবে পাঁচবার জেলে যেতে যেতেই একবার ফাঁসী যাবার সাহস আসবে।"

বিরাজ বলিল, "তা' হ'লেই তোমার খুব বাহাদুরী লওয়া হ'বে।"

রুদ্ধ-বাষ্পে বিরাজের স্বর ভারী হইয়া আসিল। সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "আমি যাব জেলে, সে জন্য তোমাদের এত কান্না কেন বল দেখি?"

কৃত্রিম তর্জ্জন দ্বারা কান্নাটাকে চাপিবার চেষ্টা করিয়া বিরাজ বলিল, "বোয়ে গেছে আমার কাঁদ্‌তে! তোমার মত লোকের তরে শেয়াল কুকুরেও কাঁদে না।"

শেয়াল কুকুরে কাঁদুক্ না কাঁদুক্, বিরাজ কিন্তু নিজের অশ্রুর উচ্ছ্বাস কিছুতেই রোধ করিতে না পারিয়া, দুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে একদিকে সরিয়া গেল। ব্রজনাথও সহাস্য-মুখে তাহাদের বাটী হইতে বাহির হইল।

পথে হরি-খুড়োর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে ব্রজনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আচ্ছা মজা বাধিয়েছ বেজো-খুড়ো, ডাকাতি ক'র্‌লে মুকুন্দ ঘোষ, আর জেলে যাবে তুমি। আচ্ছা বাবা, আমিও পোট্‌লা পুট্‌লী বেঁধে রেখেছি, তোমার পেছু পেছু যা'চ্চি।"

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি গিয়ে কি ক'র্‌বে হরি-খুড়ো?"

হরি-খুড়ো বলিল, "আর কিছু না পারি, হাকিম-খুড়োকে বেশ দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে আস্‌বো।"

ব্রজ। হাকিম যদি তোমাকে জেলে পূরে দেয়?

হরি। দিলেই বা! তুমি জেলে যেতে পার খুড়ো, আর আমি পারি না? তোমার হরি-খুড়ো এতই ভীতু নাকি?

ব্রজ। পাগলামি ক'রো না হরি-খুড়ো। কোথাও যেও না, ফিরে এসে তোমার বিয়ের যোগাড় ক'র্‌বো।

আগ্রহের সহিত হরি-খুড়ো বলিল, "মিনির সঙ্গে তো ?"

ব্রজনাথ বলিল, "যার সঙ্গে তোমার খুসী।"

ব্রজনাথ চলিয়া গেল। হরি-খুড়ো গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—"মা গো তারা ও শঙ্করি !"

যাত্রাকালে আমোদিনী ব্রজনাথের মাথায় ঠাকুরের নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাইয়া স্থির-প্রশান্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "আমিই এক রকম হাত-পা বেঁধে তোকে জেলে পাঠাচ্চি বেজো, কিন্তু এই আমি জোর গলায় ব'ল্‌ছি, এই জেলে যাওয়া তোর গলায় যে বিজয়-মাল্য পরিয়ে দেবে, সে মাল্য কোন-কালেই ম্লান হবে না ; তোর জীবন, তোর সঙ্কল্প, তোর উদ্যম, সব এক-দিনে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।"

ব্রজনাথ সাশ্রু-নয়নে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। আমোদিনী আঁচলে চোখ মুছিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোক আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল। আদালত বসিবার পূর্ব্বে নায়েব মহাশয় ব্রজনাথকে কাছে বসাইয়া অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "অন্ততঃ একটা যেমন তেমন উকীল দাও বাবাজী, আমি নিজ থেকে উকীলের ফি দিচ্চি।"

ব্রজনাথ তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিয়া উত্তর দিল, "আমি যখন নিজে অপরাধ অস্বীকার কচ্চি না, তখন মিছে কেন উকীলকে টাকা দিতে যাবেন।"

উভয় করতলে চক্ষুর্দ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে নায়েব মহাশয় বলিলেন,

"মিছে ব'ল্‌ছো কি বাবাজি, দোষ কর, ঘাট কর, মতি ভায়ার ছেলে তুমি—প্রাণটার ভিতর যে কি ক'চ্চে, তা দেখাবার হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে। কি ক'র্‌বো, মনিবের কাজ—নিমক্‌হারামি তো ক'ত্তে পারি না। তা নইলে তোমাকে আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়-করাতে হয়? গোপীনাথ হে, তোমারি ইচ্ছা!"

ব্রজনাথ তাঁহার অযাচিত স্নেহ-ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পলাইয়া আসিল।

আদালত বসিলে সাক্ষীর এজাহার আরম্ভ হইল। প্রথম গিরিশ সাক্ষ্য দিলেন। তিনি শপথ-গ্রহণ-পূর্ব্বক বলিলেন যে, ব্রজনাথ হাজরার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত লোক গ্রামে আর নাই, তাহার ভয়ে গ্রামশুদ্ধ লোক সশঙ্কিত। মারপিট্‌, দাঙ্গা-হাঙ্গমা তাহার নিত্য কার্য্য, বিস্তর ইতর-শ্রেণীর লোক তাহার এই কার্য্যের সঙ্গী; এই সকল সঙ্গীর সাহায্যে সে অনেক দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে কেহই তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হয় না।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী ইহার উপর রঙ্‌ চড়াইয়া বলিলেন, ব্রজ হাজরা ভয়ানক পাষণ্ড, তাহার ভয়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী-কন্যারা বাহির হইতে ভীত হয়। সে মধু ঘোষের বিধবা কন্যার সহিত অবৈধ-প্রণয় স্থাপন পূর্ব্বক লোকলজ্জা পরিহার করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। সে দুই তিনটী পুষ্করিণী খরিদ করিয়াছে। তাহার জল ভাল বলিয়া সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে গেলে স্ত্রীলোকদের তাড়া করিয়া থাকে। একদিন এক রজককন্যা হাট-পুকুরে কাপড় কাচিতেছিল; ব্রজ হাজরা তাহাকে আক্রমণ করে; তাহার চীৎকারে লোকজন ছুটিয়া আসিলে আসামী পলায়ন করে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীদাম ঘোষ, উমেশ আকুলি, রামধন দত্ত প্রভৃতি ভদ্রলোকেরাও

এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিলেন। অতঃপর ইতর-শ্রেণীর কয়েকজন লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইল। তাহারা সাক্ষ্য দিল যে, কাছারী-বাড়ী লুঠ করিবার জন্য বেজোবাবু তাহাদের সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সম্মত না হওয়ায়, তাহাদিগকে শাসাইয়া গিয়াছিল যে, যদি তাহারা এ কথা প্রকাশ করে, তবে তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া তাহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবে।

হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সাক্ষীদের জেরা করিবে কি না। ব্রজনাথ জেরা করিতে চাহিল না। তখন তাহার নিজের সপক্ষে বক্তব্য যাহা থাকে বলিবার জন্য বিচারক আদেশ দিলেন। ব্রজনাথ জানাইল যে, তাহার বলিবার কিছুই নাই, বিচারকের সুবিচারের উপরেই সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

নায়েব মহাশয় বিচারকের সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিলেন, "হুজুর, আসামী যথেষ্ট ধনশালী, ইচ্ছা করিলে সে বড় বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু বদ্‌মায়েসি করিয়া সাধারণের কাছে সাধু সাজিবার অভি-প্রায়ে একটা মোক্তার পর্য্যন্ত দেয় নাই। অতএব হুজুর হইতে পক্ষসমর্থন করিবার জন্য উহাকে আদেশ দেওয়া হউক।"

কিন্তু পক্ষসমর্থন করা না করা আসামীর ইচ্ছাধীন, সুতরাং বিচারক সেরূপ কোন আদেশ দিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি স্বপক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য আসামীকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধের উত্তরে ব্রজনাথ সবিনয়ে বলিল, "হুজুরের আদেশে আমি কঠোর দণ্ডও শিরোধার্য্য করিয়া লইতে প্রস্তুত ; কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, আমার দেশের লোকের মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে, একটী অঙ্গুলি সঞ্চালনও করিতে পারি না।"

জনতার মধ্য হইতে যেন একটা অস্ফুট সাধু-বাদ উত্থিত হইল।

নায়েব মহাশয় আসামীর কাঠগড়ার দিকে জ্বলন্ত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রোষ-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "যে তোমাকে এরূপ উপদেশ দিয়েছে, সে তোমার মা নয়—শত্রু।"

উত্তরে ব্রজনাথ মৃদু হাসিল। বিচারক নায়েব মহাশয়কে চুপ্ করিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া রায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নায়েব মহাশয় কাঠগড়ার দিকে কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রোষে ক্ষোভে যেন ফুলিতে থাকিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখমণ্ডল ভীষণ ভাব ধারণ করিল; ললাটের শিরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল, বিস্তৃত নাসারন্ধ্র দিয়া অজগর শ্বাসবৎ ঘন ঘন বাহির হইতে থাকিল। কিন্তু ব্রজনাথের মুখে একটুও ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, তাহা যেমন নির্ভীক, তেমনই শান্ত ও প্রফুল্ল, আসন্ন কঠোর দণ্ডের সম্ভাবনাতেও তাহাতে একটুমাত্র ভীতি বা মলিনতার ছায়া পরিদৃষ্ট হইল না। তাহার সেই ভীতিলেশ-পরিশূন্য শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিতে চাহিতে নায়েব মহাশয় যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, ব্রজনাথের সেই শান্ত প্রফুল্ল মুখখানা হইতে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিয়া নীরব তিরস্কারের ভাষায় বলিতেছে—"ও মুকুন্দ ঘোষ, বাইরের দণ্ড দণ্ডই নয়, মানসিক যে দণ্ড, তাই ভগবানের দেওয়া দণ্ড; সে দণ্ডের কাছে মানুষের দেওয়া মিথ্যা দণ্ড কত তুচ্ছ তা দেখ্।" চমকিতচিত্তে নায়েব মহাশয় স্তব্ধ জনতার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তাহাদের মুখেও সেই হাসি, সেই বিদ্রূপ, সেই তিরস্কার। নায়েব মহাশয় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ তিনি বিচারকের দিকে ফিরিয়া উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রায় লিখিবেন না হুজুর, এ মামলার রায় লিখিতে দেরী আছে।"

বিচারক চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সকলেরই কৌতূহল-

পূর্ণ দৃষ্টি নায়েব মহাশয়ের মুখের উপর পতিত হইল। পেশ্‌কার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ব'ল্‌তে চাও বল।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "আমি ব'ল্‌তে চাই, এ মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ব্রজ হাজরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

বিচারক গভীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে দোষী কে, তুমি জান?"

যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "খুব জানি, দোষী আমি নিজে।"

প্রগাঢ় বিস্ময়ে আদালত-গৃহ মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া আসিল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার প্রমাণ?"

অনুতাপ-বিশীর্ণ-কণ্ঠে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "প্রমাণ—এই মামলার সাক্ষী হরে বাগ্দী, আর ধনা মালিক। জমিদারের টাকাটা গাপ্ ক'র্‌বার ইচ্ছায় ঐ হু'টো লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমি নিজেই এই লুঠ করাই। ওরা বাক্স ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় আমি চেঁচিয়ে উঠি। কাছারীতে তিনজন পাইক শুয়ে থাকৃতো। তাদের সঙ্গেও বখ্‌রার বন্দোবস্ত ছিল। আমার চীৎকারে তারা উঠে হৈ হৈ ক'ত্তে ক'ত্তে চোর ধ'র্‌তে ছুট্‌লেন। চোরের বদলে ধরা প'ড়্‌লো ব্রজ হাজরা। ও তখন কি দরকারে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, পাইকরা ওকে ধ'রে আন্‌লে। আমিও দেখ্‌লাম, নিজেকে বাঁচাবার এ একটা চমৎকার সুযোগ। তা ছাড়া নানা কারণে ঐ ছোঁড়াটার উপর আমার ভয়ানক রাগ ছিল। আমি এক ঢিলে দুই পাখী মার্‌লাম,—উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম।"

হাকিমের আদেশে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হরে বাগ্দী ও ধনা মালিক তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া আদালত-গৃহে নীত হইল। নায়েব মহাশয় অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া তাহারা আর অস্বীকার করিতে পারিল না।

তখন বিচারক কৌতূহলী হইয়া নায়েব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মামলা তো শেষ হ'য়েই গিয়েছিল; প্রমাণের অভাব ছিল না, অপরাধীও সাজা পেতো। এমন সময় তুমি নিজে ধরা দিলে কেন?"

ইহার উত্তরে নায়েব মহাশয় বিচারককে জানাইলেন যে, তাঁহার এরূপে ধরা দিবার প্রধান কারণ—ব্রজনাথের ধৈর্য্য। সে যে দোষী নয়, চেষ্টা করিলে ইহা প্রমাণ করিতে পারিত, এবং তাহাতে সে মুক্তি বা দণ্ড পাইলে তাহাতে নায়েব মহাশয়ের কোনই ক্ষতি ছিল না; কাছারী লুঠ প্রমাণ হইয়া যাইত, ব্রজনাথও বেশ একটু বেগ পাইত। কিন্তু সে আপনার নির্দ্দোষতা প্রমাণের জন্য একটুও চেষ্টা করিল না; মামলার তদ্বির করিতে, উকীল মোক্তার দিয়া মামলা চালাইতে তিনি নিজে পর্য্যন্ত পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই এক কথা—দেশের লোকের সহিত মামলা করিব না। জেলে যাইবে, তথাপি নিজের সপক্ষে একটী কথা বলিবে না। ব্রজনাথের এই অসাধারণ ধৈর্য্যই নায়েব মহাশয়কে ধৈর্য্যহীন করিয়া তুলিয়াছে। একটা চব্বিশ বছরের ছোঁড়া এমন দোষের বোঝা মাথায় লইয়া নির্ব্বাকৃভাবে উপহাসের হাসি হাসিতে হাসিতে জেলে যাইবে, আর পঞ্চাশ বছরের বুড়ো তিনি—আজ বাদে কাল কালের চিঠী আসিবে, জেলের ভয়ে এত বড় সত্যটাকে চাপিয়া রাখিয়া ঐ ছোঁড়ার উপহাসের পাত্র হইবেন? এই মর্ম্মান্তিক যাতনা অপেক্ষা জেলে যাওয়া লক্ষগুণে ভাল।

আসামী তিন জনকে হাজত-বাসের হুকুম দিয়া বিচারক ব্রজনাথকে মুক্তি দিলেন। ব্রজনাথের জয়ধ্বনিতে আদালত-গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে ভৈরব চক্রবর্ত্তী, গিরিশ সরকার প্রভৃতি যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদিগকে সকলেই ধিক্কার দিতে লাগিল। এমন কি, উন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাহাদিগকে হাতে হাতে মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রতিফল দিতে উদ্যত হইল। ব্রজনাথ বহু কষ্টে তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমোদিনীর উক্তি সার্থক হইল ; ব্রজনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়া দেশের শত্রু মিত্র সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিল। তাহাদিগকে লইয়া ব্রজনাথ মহোৎসাহে গ্রামের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। আমোদিনীও এবার ব্রজনাথের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং ব্রজনাথের সকল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া বিবাহের দিন-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

কন্যা-আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বদিনে আমোদিনী ব্রজনাথকে বলিলেন, "একবার মেয়েটাকে দেখ্‌তে যাবি রে বেজো ?"

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি দেখ্‌তে যাব নতুন-মা ?"

আমোদিনী বলিলেন, "ভাল-মন্দ নিজের চোখে দেখে আস্‌বি। তোর ত একটা পছন্দ অপছন্দ আছে।"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "মায়ের পছন্দের উপর ছেলের পছন্দ ?"

আমোদিনী বলিলেন, "তা' হ'লেও তুই উপযুক্ত ছেলে। এর পর আমাকে দোষ পেতে না হয়। হাজার হোক্ আমি তো সৎ-মা।"

ব্রজনাথ বলিল, "তোমার মত সৎ-মা গাঁয়ের সব লোকগুলা যদি পায় নতুন-মা, তা' হ'লে আমি তিন দিনে গাঁ-খানাকে স্বর্গ ক'রে তুল্‌তে পারি।"

তাহার মুখের উপর স্নেহ-সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "গাঁ-খানা স্বর্গ হোক্ না হোক্, জেলখানাটা গুল্‌জার হ'য়ে পড়ে বটে।"

ব্রজনাথ মৃদু হাসিল। আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা, কাল না মামলার দিন ছিল ? নায়েব-বুড়োর কি হ'লো ?"

ব্রজনাথ বলিল, "তাঁর সাত মাসের জেলের হুকুম হ'য়েছে, আর তাঁর সঙ্গীদের তিন মাস।"

সদুঃখে আমোদিনী বলিলেন, "আহা, বুড়ো-মানুষ, সাত মাস জেল খাট্‌তে হবে!"

ব্রজনাথ বলিল, "কি ক'র্‌বো নতুন-মা, বুড়োর কপাল। নইলে বুড়ো আমার ঘাড় থেকে নিজের ঘাড়ে জেলটা টেনে নেবে কেন?"

আমোদিনী বলিলেন, "সে কি টেনে নেয় রে বেজো, ভগবান্ টানিয়ে দেন। মানুষ যতই চেষ্টা করুক্, ভগবানের শাসন কিছুতে এড়িয়ে যেতে পারে না।"

ব্রজনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "আগে না বুঝ্‌লেও এখন সেটা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি নতুন-মা।"

আমোদিনী বলিলেন, "কিন্তু ঐ সঙ্গে চক্রবর্ত্তী-বুড়োর কিছু হ'তো?"

সহাস্যে ব্রজনাথ বলিল, "তাঁরও যথেষ্ট হ'য়েছে নতুন-মা, সেই যে সাক্ষী দিয়ে এসে বাড়ী ঢুকেচেন, আর বাড়ীর বাইরে পা দিতে পারেন নি। বাইরে এলেই ছেলেগুলো পিছনে হাততালি দেয়। এদিকে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে ব'লে অনেক যজমানও তাঁকে ত্যাগ ক'রেছে।"

গম্ভীর-কণ্ঠে আমোদিনী বলিলেন, "ঠিকই হ'য়েছে, একেই বলে ভগবানের শাসন। এখন গিরিশ সরকার—

ব্রজনাথ বলিল, "সে বেচারীকে অনেকটা ভয়ে প'ড়ে নায়েব মশায়ের হুকুম তামিল ক'র্ত্তে হ'য়েছে। আজ যে তাঁর মেয়ের বিয়ে।"

আমোদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নিমন্ত্রণ আছে নাকি?"

ব্রজ। হাঁ, নিমন্ত্রণ আছে, যেতেও হবে।

আমো। যাবি তুই?

ব্রজ। কেন যাব না নতুন-মা ? যেতে তুমি নিষেধ কর ?

আমো। নিষেধ করি না, কিন্তু পরের কথায় নেচে ঐ লোকটা তোকে কি ভোগই না ভুগিয়েছে।

ব্রজ। সে আমার অদৃষ্টের ভোগ।

আমোদিনী আর কিছু বলিলেন না ; ব্রজনাথ কাপড় ছাড়িয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়া গেল। আমোদিনী জপ আহ্নিক শেষ করিয়া শয়ন করিলেন এবং যতক্ষণ না ঘুম আসিল, ততক্ষণ বিছানায় পড়িয়া ব্রজনাথের বিবাহের কথা ভাবিতে লাগিলেন। স্বামীর মৃত্যু-শয্যার পাশে বসিয়া ব্রজোর বিবাহ দিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই ; এইবার বোধ হয় চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। কোথায় তুমি ? যেখানেই থাক, সেইখান হইতেই আশীর্ব্বাদ কর, যে ব্রজনাথের বিবাহে হন্তারক হইয়া একদিন তোমার মর্ম্মে আঘাত দিয়াছিলাম, সেই ব্রজকে সংসারী করিয়া যেন গর্ব্বের হাসি হাসিতে হাসিতে তোমার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।

ভাবিতে ভাবিতে আমোদিনী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া যখন দেখিলেন, ব্রজ নিমন্ত্রণ খাইয়া রাত্রিতে ঘরে ফিরে নাই, তখন তাহার জন্য আমোদিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, এবং ব্রজনাথের সন্ধান লইবার জন্য চাকরকে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী বিপিন ঘোষের ছেলে চারুর মুখে সংবাদ পাইলেন যে, গিরিশ সরকারের মেয়ের বিবাহে ভয়ানক গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল ; পণের তিনশত টাকার মধ্যে একশত টাকার অকুলান হওয়ায় বরের বাপ রাগিয়া বর ও বরযাত্র লইয়া চলিয়া যান। ইহাতে গিরিশ সরকার অনন্যোপায় হইয়া কাঁদা-কাটা করিতে থাকেন। তখন ব্রজনাথ

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গিরিশ সরকারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া আমোদিনী স্তম্ভিত হইলেন। ব্রজ গিরিশ সরকারের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে! গিরিশ সরকারের তেমন শত্রুতা ব্রজ ভুলিল কিরূপে? সে মানুষ, না কি? আমোদিনী যতই ব্রজনাথের কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই বিস্ময় ও গর্ব্ব আসিয়া তাঁহার হৃদয়টাকে অভিভূত করিয়া দিতে থাকিল।

* * * *

বিরাজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এ তোমার মন্দ জেলে যাওয়া নয় বেজো-দা!"

ব্রজনাথ সহাস্যে উত্তর করিল, "মন্দ নয় কি রাজু, এ যে ভয়ানক জেলখানা! জানিস্ তো, কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি—"

"নারী" বলিয়া বিরাজ হাসিয়া উঠিল। আমোদিনী প্রশান্ত-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, "এ তোর জেলও নয়, ফাঁসীও নয় বেজো, এইটাই তোর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজয়-মালা—যা' তুই পাঁচ বছর জেলে গিয়েও অর্জ্জন ক'ত্তে পার্‌তিস্ না। শত্রুর অপকারের প্রতিদানে এমন উপকার ক'রে আজ তুই যথার্থ ই দেশের—সমাজের সংস্কারক হ'বার যোগ্য হ'য়েছিস্। আশীর্ব্বাদ করি, তোর এই যোগ্যতা কোন দিন যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।"

ব্রজনাথ ভূলুণ্ঠিত হইয়া আমোদিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সকলেই আনন্দিত হইল। এই সার্ব্বজনীন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কেবল হরি-খুড়ো দুঃখ-প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, বেজো-খুড়োর এদিকে সব ভাল, শুধু কথার ঠিক নাই। নিজে যখন বিধবা-বিবাহ ক'র্‌লে না, তখন আমিই বা কোন্ লজ্জায় ক'র্‌বো! দূর হোক্, বিয়েটা আর হ'লো না।"

বিবাহের আশায় নিরাশ হইয়া হরি-খুড়ো গাহিতে লাগিল·

"মা গো তারা ও শঙ্কার !
তুমি কোন্ বিচারে আমার উপর
ক'র্‌লে দুঃখের ডিক্রীজারি !"

সম্পূর্ণ